চলো মন রূপনগরে

কালকূট

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৬৮

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা ৯

মুদ্রাকর
যামিনীভূষণ উকিল
দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণি
কলকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

শ্রীঅম্বরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু—

খোরাকির বরাদ্দ বড় কম। যতোটা চাই, ততোটা জোটে না। আর, এ এমন এক খোরাক, অঢেল দিয়েও কেউ ভরিয়ে দিতে পারবে, সে-কথা কেউ কবুল করতে চাইবে না। বেফাঁস বলে বিপদে পড়ে যাবে। এ বরাদ্দ ঝোলায় ভরে দেবার না। তা হলে, ঝুলি পূর্ণ হলেই তুষ্টি। এবার বিদায় হই।

না, এ খোরাক সেরকম না। পেট ভরানোর বরাদ্দ যাকে বলে। তবে ঐ কি এক কথায় যেন বলে, শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। পেট ভরানোর বরাদ্দকে কস্মিনকালেও বাদ দেবার না। ঐটিতে মহাপ্রাণীর ক্ষণজন্মের প্রথম থাবা। সে-মহাপ্রাণীটিকে সবাই চেনে, যাবত জীব সকলে। কারণ, প্রাণের মধ্যেই বসে আছেন সেই মহাপ্রাণীটি। চেনাচিনিরই বা কী কথা। জান্ পহ্চনের ধার ধারে না সে। সময়মতো নিজেই জানিয়ে দেয, সে আছে বড় বিষম করে। ভুলে থাকবার কথা আসেই না। মরতে বসলেও, সে যমের মতোই নাছোড়। কথাটা উলটা কলের মতো শোনাচ্ছে। মরতে যে বসেছে, সে তো যমেরই হাত ধরা। তবু, কথায় বলে, যমে ছাড়ে না। যমের মতো না-ছোড় কথাটা হলো তুলনা। আসলে, সে যে যমেরও অধিক। বলি বটে, যমে ছাড়ে না। আসলে কথাটা কী? প্রাণ ছাড়ে না। মৃত্যুকে অনিবার্য জেনেও, কে কবে প্রাণ দোহনে পরাঙ্মুখ?

কথা পাড়তে গেলেই, কথার গতিকে কথা আসে। যে কথাটা পেড়ে বসতে গিয়েছি, তার প্রথম বয়ান খোরাকির বরাদ্দ নিয়ে। সেটা এক অভর খোরাকি। তার সঙ্গে পেট ভরানোর খোরাকিটাকে একটু মাত্র খাটো করে দেখাটা, বিষম ঠেক দিল। সেই জন্য মহাপ্রাণীর কথাটা এলো নিজের গরজেই। ঠোঁটে বাঁকা হাসি, চোখে ভ্রূকুটি। যেন এমন একটা জিজ্ঞাসা, বড় এলেমদার খোরাকির খাউনতুরে বটে! আমি কোথায় হে?

তৎক্ষণাৎ করজোড়ে প্রণিপাত। হে মহাপ্রাণী, তুমি সকলের অগ্রে। তুমি অভ্যন্তরে। বাহিরে। তুমি সর্বব্যাপী। তুমি তাবৎ জীবের গর্ভাধানকালে থাকো গর্ভবতীর ভুক্ত ভোজ্যে। জন্মমাত্র জননীর বুকের ধারায়। তারপরে এ সংসারে তুমি অন্ন নামে বিরাজ কর। তোমার বয়স নেই, জাতপাত নেই, লিঙ্গ ভেদ নেই। তোমার দেশ নেই, কালাচার নেই। তোমার কাছে ধনগর্বী নির্ধন নির্বিচার। তুমি গাঢ় অন্ধকার। মহা তেজযুক্ত আলো। কলঙ্ক। অকলঙ্ক পুণ্য। বীভৎস। সুন্দর। অপমান। সম্মান।

ক্রুর নিষ্ঠুর। সীমাহীন দয়ালু। তুমি অশেষ। আদি ও অন্তহীন। সেই কারণেই মানুষ নামক জীবের কাছে তুমি দেবী ও দেবতা।

হলো? বাব্বা! এর চেয়ে বেদ আর উপনিষদ থেকে বেছে বেছে কিছু উদ্ধৃতি দিলেই হতো। নাও, এবার ঘর করতে দিবানিশি যা বলি, তুমি তা ই। তুমি ক্ষুধা। তোমাকে বাদ দিয়ে, খোরাকির কথা পাড়িনি। তাবৎ জীবের এ ক্ষুধাকে জৈবিক বললে খাটো করা হয় না। তার জন্যে, অন্নচিন্তা, চমৎকার। কিন্তু এ চমৎকারিত্ব দিয়ে, মানুষের সকল চমৎকারিত্ব ভরে ওঠেনি। সে তো কেবল পেটে বাঁচে না। মনে বাঁচার গতি কি? অমোঘ রূপে ভরা এ জগতটার সামনে দাঁড়িয়ে, জিজ্ঞাসাটা তো কেবল আমার মতো বুকে ধরা গরলধারীর না। যবে থেকে মনের উন্মেষ, তবে থেকে এ জিজ্ঞাসা। আর এ জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে গিয়ে, কতো জনে কতো দান দিয়ে গিয়েছেন। সেই সব দান নিয়ে যখন নাড়াচাড়া করি, তখন অন্যতর ক্ষুধায় মনটা আতুর হয়ে ওঠে। এ দান নিতান্ত বস্তুতে ভরে না। তাই ঐ বচন। যতোটা চাই, ততোটা জোটে না। এ খোরাকির রকম ভিন্ন। সেইজন্যই বলা, অঢেল দিয়েও কেউ এ খোরাকির বরাদ্দ ভরিয়ে দেবে, এমনটা কেউ কবুল করবে না। যদিও বা করে, ঝোলায় ভরে দেবার বস্তুতে, তবে সেখানেই তার ইতি তুষ্টি।

রূপের ফেরে পড়েছি যে! পড়েছি জন্মে অবধি। আর এই রূপের ফেরে পড়ে, সেই কোন সকালে যাত্রা করেছি। বেলা হয়ে গেল। বেলা তো বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। সকলে যখন জাগতিক ক্ষেত্রে শিকড় গেড়ে, স্বভাবে বসছে, আমি তখনও কাঙাল হয়ে ফিরছি। কেন না, মন মজেছে, কিন্তু মন ভরেনি। ভরছে না। কেউ গেয়ে গেলেন, জনম অবধি রূপ দেখেও, চোখের তৃষ্ণা মিটলো না। চোখের তৃষ্ণা। কেবল যদি রূপ হতো, তবে চোখ অনেকখানি। কিন্তু অরূপের কথাটাও কোথা থেকে যেন, রূপের ঘরে এসে মিশেছে। তার রূপ কী? কেমন? সে কি এই প্রকৃতিতে বিরাজ করে? পথে প্রান্তরে, গ্রামে জনপদে, আর মনুষ্য সমাজে? রূপের এই ধারাবাহিক গতিময়তার মধ্যে, অরূপের রূপ কেমন? সে কি বচনে আছে? অবলোকনে? না কি, কেবল অনির্বচনীয়তায়?

জানি না। রূপের ফেরে পড়েছি। রূপের সুধা পাইনি। কথাটা শুনলে লোকে বাতুল বলবে। কিন্তু, মিছে কেন বলবো? আর কাকেই বা বলবো? রূপের ফেরে পড়া, বড় জ্বালা। তার বাড়া জ্বালা, রূপের সুধা যখন পাই না। জ্বালায় জ্বলি। পাগলও হলাম। রূপের বিষে উথালি-পাতালি বুক। না, কেউ জোর করে এ রূপের বিষ পান করিয়ে দেয়নি। সেই গানটার মতোও না, আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান। এ বিষের জন্ম কোথায়, কোন ধারায় বহে, জানি না। কেমন করে, কোন্ অবকাশে বুকের মধ্যে চুঁইয়ে ঢোকে, টের পাওয়া যায় না। কখন কী ভাবে তার ক্রিয়া শুরু হয়, আগে থেকে তার কোনো ঘোষণা থাকে না। ক্রিয়া যখন শুরু হয়ে যায়, তখন দেখি, আমি রূপের বিষে মত্ত মাতাল। ঘর ছেড়ে পথে পথে ফিরছি।

এই ফিরতে ফিরতে দেখি, এ বিষে আমাকে একলা খায়নি। অনেককে খেয়েছে। আর যে যার মতো ফিরছে। এ ফেরাটা ইংরেজির 'রিটার্ন' না। যে-বোঝে সে বোঝে। এ ফেরাটা, পথে পথে। কেমন করে রূপের বিষ বুকে ঠাঁই করে, যেমন জানা যায় না, তেমনি ফেরাটা তোমার হাতে নেই। অনেকবার কসম খেয়ে বলেছি, আমি ঘর বিবাগী বৈরাগী না। পুণ্য সঞ্চয়ের তীর্থযাত্রী না। সংসার আমাকে ঘিরে। আমি সংসারের জীব। চোখে দেখা যায় না, কিন্তু সারা অঙ্গে কত বেড়ি, কেউ দেখতে পায় না। দশ জনের বাইরে আমি নেই। দশজনের একজন হয়ে, সংসারের আঙ্গিনায়, এ জন্মটার শোধ দিচ্ছি। নাকি, সংসার আদায় করে নিচ্ছে?

একটা কিছু হবে। তবু, তার মধ্যেই দেখি, সেই যে রূপের বিষে খেয়েছে, তার নেশায় মাতাল হয়ে রয়েছি। হঠাৎ সেই মাতালটাকে কে হাতছানি দিয়ে বাইরে ডেকে নিয়ে যায়। আর সেই ডাকটা এমন নির্ঘাৎ, কোনো ওজর মানে না। কাজের ঘরে তুক। কাজে মন বসে না। কর্তব্য দায়-দায়িত্ব? ঢের হয়েছে। ঐ সেই পুরনো গানটার মতোই, 'শুনিয়া বাঁশির গান/মন করে আনচান/গৃহকার্য রয় না আমার স্মৃতিতে।'...এই ডাকের নিয়ম কানুন বেবাক আলাদা। সেই কারণে বলি, এই পথের ফেরাটা তোমার হাতে নেই। কেন না, তখন তুমি রূপের হাত-ধরা। রূপ তোমাকে যেমনি চালাবে, তেমনি চলবে।

অতএব চলো।

চলবো তো। চলতে গিয়ে, মুখপাতের কথাটাই তাই আগে মনে এলো। খোরাকির বরাদ্দ বড় কম। ডাকের বহর দেখে মনে হয়, অলক্ষের হাতছানি বুঝি এই দুনিয়াটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে। একেবারে গৃহটার এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো। ছাই! হুগলী জেলার উত্তর বাগে এসে, বলতে গেলে বিপথে ছেড়ে দিয়ে বলে, চলো। যা রয়, তাই সয়। ঘরের কোণটা দেখ। খোরাকির বরাদ্দ কতোটা কম, তার ওজন ঠাহর হবে পরে। এ খোরাকির মাপ গুনে। কুনকে পাল্লায় না।

কাথাটা মিথ্যা না। মনভাসির টান খেয়া পেরিয়ে, মুক্তবেণীর উজানে গিয়ে, আবার ফিরে যাত্রা। দেখছি, রূপের ফেরেই আছি। তবে মুক্তবেণী থেকে শ্যামা ক্ষ্যাপার তরীতে ভেসে গিয়েছিলাম বলে, স্থলের টানটা থেকে গিয়েছিল। ভেসে যাওয়া এক কথা। তার রকম ভিন্ন। আর পায়ে চলা, আর এক কথা। তার রকম ভিন্ন। পাখির মতো ডানা নেই বটে। তবু থেমে থেমে, খুঁটে খুঁটে দানা খাওয়া যায়। জলের স্রোতের ডিঙায় ভেসে, দানা খুঁটে খাওয়াটা তেমন মনের মতো হয় না।

শ্যামা ক্ষ্যাপার আশ্রম থেকে ফেরার সময়টায়, বাতাসে উত্তরের হিমেল নখের আঁচড় ছিল। সেই সময়েই কুন্তী আমাকে টেনেছিল। উজানের টানে ভাসতে গিয়ে, কুন্তীর খরস্রোতা গতরটিকে গঙ্গায় এলিয়ে পড়তে দেখেছিলাম। ফেরার পথে, কুন্তী আমাকে নামিয়ে নিয়েছিল। আসলে দামোদরের কন্যাটিকে যতোটা খরস্রোতা

দেখেছিলাম, আদৌ ততোটা না। তার মাঘের শীর্ণতায় কেমন একটা ম্লান হাসির কিরণ ছিল। অথবা, সেটা বেলা শেষের মায়া। তার ঢালু আদুর গা দু পারের চড়ায় তখন রবি খন্দের সবুজ আঁচল।

কেন তার নাম কুন্তী, কে জানে? কুন্তী নামে তো একজনকেই জানি। সে আমাদের ইতিহাসের প্রাচীন রমণী শ্রেষ্ঠা, প্রাতঃস্মরণীয়া কন্যা। প্রাণটি তার বড়ই বহতা ছিল। মনে চির রমণীর দেহের লীলা। খরস্রোতা নিঃসন্দেহে। না হলে আইবুড়ো কন্যেটি এক অপরূপ পুরুষকে ডেকে, তার অঙ্কশায়িনী হতো না। সোজা কথা না। বিয়ের আগে মেয়ে এক বিয়োনী হয়ে গেল। তারপরেও, অভিশপ্ত অক্ষম স্বামীর পত্নীটি, পরপুরুষদের ডেকে, তিনটি সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিল। পুরাণ বলে, রহস্যের আবরণে ঢাকা দিয়ে রেখো না। পুরাণ তোমার ইতিবৃত্ত। সে ইতিহাসের লিখন বড় জটিল। ভেদ করতে পারলে, কুন্তীর প্রার্থিত পুরুষদের পরিচয় পেলেও পাওয়া যেতে পারে।

সেই যাই হোক। ইতিহাসের কুন্তী থাক। এই দামোদের কন্যাটির নাম কেন কুন্তী, সেটা কখনও জানতে পারিনি। এমন অনেক কন্যারই নামের কারণ জানা যায় না। মাঘের সেই বেলা শেষে, কুন্তীর কিশোরী অঙ্গে তখন রক্তিম আভা। রেল ইস্টিশন ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিলাম বড় রাস্তার সাঁকোর ওপরে।

এইখানে একটা কথা। ধরতাইটা না ধরিয়ে দিলে, গোলেমালে হরিবোল হবার সম্ভাবনা। এই বৃত্তান্ত সেই ইংরেজি পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝির সময়। উনিশ শো পঞ্চান্ন। তখন গ্রাম নিত্যানন্দপুরের পাশে কারখানা হয়নি। আশেপাশে এখনকার মতো এতো বসত ভিড় গোলমাল ছিল না। গাড়ির চল ছিল কম। সাঁকোর রাস্তাটার গায়ে তখনও নতুন গন্ধ। রাখাল আলস্যে ফিরছিল গরুর পাল নিয়ে। দু-চার মানুষের আনাগোনা। চারদিকে গ্রামের নিঝুমতা। মৎস্যজীবী ঘেরা জাল পাতছিল কুন্তীর বুকে। বিকেলে চুল বাঁধা সাঙ্গ করে, বউটি ঘাটের তালের গুঁড়িতে পা ডুবিয়ে বসেছিল।

হঠাৎ উত্তর থেকে একটা মোটর বাস এসে থেমেছিল সাঁকোর ওপারে। কয়েক যাত্রীর ওঠা নামা। তার মধ্যে একজন কী কারণে সাঁকোয় এসে দাঁড়ালো। সে আমার বেলা শেষের মোহ কী না, বুঝে উঠতে পারিনি। মনে হয়েছিল কুন্তী নিচে থেকে, লাল জামায় নীল শাড়ি জড়িয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। বাস্তববাদী বাবুরা ভোজ-বাজীতে বিশ্বেস করেন না। কিন্তু সংসারে হোক, আর সংসারের বাইরে হোক, গোটা ব্যাপারটা বৃহৎ সংসারেরই। আজ পর্যন্ত, সে-সংসারের যাবৎ বিষয়ের যুক্তি কেউ দেখাতে পেরেছেন বলে জানি না।

দেখেছিলাম, চোখে তার কৌতুকের ছটা। মুখে সারাদিনের ঘুরে ফেরা ধুলার প্রলেপ। এলোমেলো অবিন্যস্ত। অথচ মুখের হাসিটি তাজা। সারা শরীরে লাবণ্যের নম্রতা। কথা কি বলেছিলাম? শুনেছিলাম কি দুই চার অস্ফুট উক্তি? মনে পড়ে না। কেবল, আজও দেখছি, কুন্তী নদীর সাঁকোয় এক সন্ধ্যায়। সে অম্লান হয়ে আছে।

সেই মাঘে ফিরে গিয়েছিলাম। আবার চৈত্র শেষেই ফিরে এলাম। কুন্তীর কূলে আর যাইনি। নদী পেরিয়ে ইস্টিশন, নাম ডমুরদহ। গাড়ির এঞ্জিন ফোঁস ফোঁস করছে। গার্ডবাবু বাঁশি বাজিয়ে নিশান দেখিয়ে দিয়েছেন। এক্ষুনি কুক্ দিয়ে গাড়ি ছাড়ল বলে। পকেটে টিকেট রয়েছে গুপ্তিপাড়ার। থাকলেই বা। ভোরের প্রথম ট্রেনের যাত্রী। এখন তো সবে সকাল। গ্রামটা হাতছানি দিচ্ছে। গাড়ি নড়ে উঠলো। ঝট-পা বাড়িয়ে নেমে পড়লাম। এক রাশ ধোঁয়া ছড়িয়ে, গাড়ি চলে গেল মাঠের বুকে ঝুকুস ঝুকুস শব্দ তুলে।

যাত্রী যারা নেমেছিল, তারা কে কোথায় চলে গেল। দেখলাম, পশ্চিমে দূরগামী সড়ক। পুবে গ্রাম। ইস্টিশনের ঘরটা দক্ষিণে। হালের ডমুরদহ গাঁয়ের কথা যদি কেউ ভাবো, তা হলে গোলমাল। এই আশি দশকের সংক্রান্তিতে, ডমুরদহ ইস্টিশনের সামনের চেহারা বিলকুল বদলে গিয়েছে। পশ্চিমে রাস্তার মোড়ে বেশ কিছু দোকানপাট। পুবে গাঁয়ের পথে, দু পাশে পাকা বাড়ি। পিচের রাস্তা, বিজলি আলো। গঞ্জ গঞ্জ ভাব। ট্রানজিস্টারে গান বাজে। এনতার সাইকেল চলে। বড় সড়কে নিমেষে নিমেষে ছোট বড় মোটর গাড়ির ছুটোছুটি। কল-কোলাহলে, আর সাজ বদলে, শহর হয়ে ওঠার ইচ্ছেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আমি সেই সকালে যখন নামলাম, নিঝুম গ্রামের বুকে, নিঝুমতর ইস্টিশন। দক্ষিণে গিয়ে, ইস্টিশনের সামনে গিয়ে দেখলাম, কপালে লেখা ১৯৪৬। বোধহয় ইস্টিশনের জন্ম সাল। পশ্চিমের মোড়ে, একটা ঘর। দু পাশে জঙ্গল। রাস্তার ধারে একটা সাইকেল রিকশা।

ওদিকে আমার টান নেই। আমি পুবের রাস্তা ধরলাম। দুই চারজন চাষীবাসী, মাটি ঘাঁটা মানুষ আপন মনে এদিকে ওদিকে চলে। বারেক চোখ ফিরিয়ে অচেনা লোকটাকে দেখে যায়। চোখে কৌতূহল। কিন্তু সে তো মেটবার না। আমিও মেটাতে পারি না। তবে বুঝতে পারি। নজরে জিজ্ঞাসা, কোথা থেকে আগমন? কোন্ বাড়িতে গমন? কার গৃহে?

কোনো গৃহে না। এই গ্রামের ধারে পুবের নদীতে গত সাল ভেসে ভেসে গিয়েছিলাম। নদীর বুক থেকে দেখেছি। এবার কূলে ভিড়েছি। সেই একই কথা। ফেরাটা তোমার হাতে না। কেন যে নেমে পড়লাম, তার কোনো জবাব নেই। কেমন একটা হাতছানি পেলাম। নেমে পড়লাম। কী আছে, কী নেই, সে-বিবেচনার ধারে কাছে নেই।

পুব দিকে একটু গিয়ে, এক পথ দক্ষিণে। আর এক পথ সোজা পুবে গিয়ে, উত্তরের বাঁকে। পথে দু-একটা কাঁচা ঘর; বাদ বাকি দু পাশে ঘন জঙ্গল। ডাইনের রাস্তাটা খানিক গিয়ে, বাঁয়ে গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গিয়েছে। পুবের সোজা রাস্তাটা, প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে উত্তর বাঁক নিয়েছে। অনেক দূর অবধি দেখা যায়। রাস্তাটা ইঁট সুরকির বাঁধানো বটে। গরুর গাড়ির চাকার দাগ গভীর আর এবড়ো খেবড়ো। চৈত্রে ধুলা জমেছে।

কোন দিকে যাব? উত্তরের বাঁকটাই টানছে। পথের ধারে বাড়ি-ঘর দেখতে পাচ্ছি না। পুবে নিবিড় গাছপালা। গ্রাম কি ওদিকেই? এত খোঁজ-খবরে দরকার কী? উত্তরের বাঁকে এগিয়ে গেলাম। সকালে এখনও চৈত্রের তাপ টের পাওয়া যাচ্ছে না। বাতাসে যেন অনাগত ঝড়ের সংকেত। কিন্তু আকাশ ঝকঝকে নীল। এক ঝাঁক পায়রা বাঁ দিকের ধান কাটা মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। রোদের ঝলকে চিত্র গ্রীবায় ঝিলিক রঙের ঝিলিক। তবে ধান কাটা মাঠ একেবারে রিক্ত খাঁ খাঁ না। এখনও রবিশস্যের ছিটেফোঁটা কোথাও কোথাও রয়ে গিয়েছে।

উত্তরে বাঁক নিয়ে, ডান দিকে তাকিয়ে দাঁড়ালাম। গাছপালা ঘেরা বাগান। ভিতরের দিকে ঘর দরজা দেখা যায়। অথচ লোকজন চোখে পড়ে না। গৃহস্থের বাড়ি হলে, এত নিরিবিলি দেখাতো না! এতো চুপচাপ থাকতো না। রাস্তার ধারে, বাগান ঘিরে, সীমানায় তারের বেড়া। অথচ ভিতরে যাবার পথ খোলা। ভিতরের ডান দিকে একটা টিউবওয়েল রয়েছে। সোজাসুজি তাকালে, একটা বটের ছায়ায় চালা ঘর। আরও দূরে, জলের রেখায় রোদ চিক্‌চিক্ করছে। গঙ্গা?

'কে? কোথায় যাওয়া হবে?' বেশ ভারী আর মোটা গলা একেবারে কানের কাছে। চৈত্রের ঘোর দুপুর না, যে ভূতের আবির্ভাব হবে। নিঝুম দুপুরের একটা নিরাকার জীবন্ত রূপ আছে।

সেই রূপে ঘোর লাগে। সেই ঘোরে অনেক স্বপ্ন। ভূত বোধহয় সেই স্বপ্ন থেকেই উঠে আসে। কিন্তু, এই সকালবেলায়, ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, যেন মাটি ফুঁড়ে একটি মানুষ উঠে এসেছেন। দাঁড়িয়েছেন একেবারে গায়ের কাছাকাছি। মাথার অবিন্যস্ত চুল কাঁচা-পাকা। কয়েক দিনের আকাটা গোঁফ-দাড়ির রঙও সেইরকম। মুখে কিছু গাঢ় রেখার হিজিবিজি। মোটা ভুরুর নিচে, চোখ দুটি বেশ বড়, আর তারা দুটি উজ্জ্বল। দৃষ্টি গভীর। একটু কি ঢুলুঢুলু ভাব? মুখে কিঞ্চিৎ হাসির ছোঁয়া। খড়্গ নাসা না হলেও বেশ চোখা। অথচ চোখে মুখে তেমন একটা জিজ্ঞাসার অভিব্যক্তি নেই। ঈষৎ কৌতূহল মাত্র। গায়ে একটি বুক খোলা জামা। সামান্য ধুতির কোঁচা হাঁটুর কিছু নিচে। পায়ে এক জোড়া পুরনো ধুলা মাখা চটি।

'কোন্ দিক দিয়ে এলেন?' বললাম, 'বিশেষ কোথাও যাবার নেই। এখানেই বেড়াতে এসেছি।'

'বেড়াতে?' যেন অবাক দিনের চেনা, এমনি একটি হাসি ছড়ালো মুখের ভাঁজে। তারপরেই আবার মোটা ভুরু কুঁচকে উঠলো। ভারী আর মোটা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কারোর বাড়িতে?'

বললাম, 'না। এমনি, বেড়াতে—মানে—।'

কথাটা শেষ করতে পারলাম না। মহাশয়ের বড় চোখে, তখনো ভ্রূকুটি। অস্বস্তি বোধ করলাম। এমনি বেড়াতে মানে কী? চেনা পরিচিত কেউ নেই। গ্রামের মধ্যে আন্‌কা লোকের প্রবেশ। সন্দেহ করতে দোষ কী? কিন্তু মহাশয়ের মুখে হাসি

ফুটলো। হাসি বাজলো দরাজ গলায়। তারপরে হঠাৎ হাসি থামিয়ে আমার আপাদমস্তক দেখলেন। দেখতে দেখতে আবার হাসি, 'বেড়াতে? মানে, এমনি বেড়াতে? বাঃ বেশ বেশ। ভাল কথা। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

জবাব দিতে সবে মুখ খুলতে যাবো। তার আগেই মহাশয়ের হাত উঠে এলো মুখ থাবাড়ির ভঙ্গিতে। ঘাড় ঝাঁকিয়ে আওয়াজ দিলেন, 'বুঝেছি বুঝেছি, কলকাতা।' কিন্তু মধুমাস চৈত্রের বাতাসেও কি মধুর গন্ধ ছড়ায়? আমার নাসারন্ধ্র স্ফীত হলো। এতক্ষণে চোখে ঠেকলো, মহাশয়ের ডাগর উজ্জ্বল চোখ দুটি যেন কিঞ্চিৎ রক্তাভ। ঢুলুঢুলু আগেই দেখেছি। তা বলে এই সাত সকালে? না কি রাত্রের বাসি রসের মৃদু গন্ধ? অথবা আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে গোলযোগ? বুঝে ওঠার আগে, তাঁর কথার জবাব দিতে গেলাম।

মহাশয়ের হাত নড়ে উঠলো, 'আর বলতে হবে না, বুঝেছি। কাঁধের ঝোলায় কী আছে?'

জিজ্ঞাসার সঙ্গে মোটা ভুরু জোড়ায় ঢেউ খেললো। চোখের ঝিলিকে, আর ঠোঁটের হাসিতে রহস্য। হঠাৎ এমন প্রশ্ন? কিছু মন্দ সন্দেহ করছেন নাকি? ওদিকে, অনেকক্ষণ থেকেই কালা পাখির কুহু শুনতে পাচ্ছিলাম, দূর থেকে ভেসে আসা বাতাসে। এখন হঠাৎ কানের কাছে সপ্তমে বেজে উঠলো, কুহু কুহু। বললাম, 'ঝোলার মধ্যে—?'

'রঙ তুলি কাগজ আছে তো?' মহাশয় যেন আত্মবিশ্বাসে নিশ্চিত। চোখ বুজে মাথা ঝাঁকালেন। আবার চোখ খুলে হেসে বললেন, 'বুঝেছি। এই সেদিনেও তোমার মতন এক ছোকরা এসেছিল। তার ঝোলায়ও রঙ তুলি কাগজ ছিল। আমিই তাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলাম। এস, তোমাকেও জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি। হুঁ, কেবল নৈসর্গ নয় হে। প্রকৃতির গভীরে জীবলীলার খেলা দেখতে হবে। এস, দেখাচ্ছি।'

এবার বেজায় ঠেক লাগলো। নৈসর্গ, প্রকৃতির গভীরে জীবলীলা কথাগুলো, কেমন যেন ধন্দ লাগিয়ে দিল। দেখে তো মহাশয়কে চালচুলোহীন ছন্নছাড়া ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনি। তাঁর মুখে এমন বচন! হাঁড়ির হাল দেখে কিছু বোঝা যায় না। খাসা চালের ভাণ্ডে, খাসা চালের কথা লেখা থাকে না। এ দেখছি সেইরকম। আমার টনক নড়লো। মনের অবাক কোণে শ্রদ্ধাবোধ। বুঝতে অসুবিধে হয়নি, উনি আমাকে কিছুদিন আগের ছোকরা আগন্তুক শিল্পীর মতোই একজন ভেবেছেন। দেখছি, উনি উত্তরে পা বাড়াচ্ছেন। আমি ডেকে বললাম, 'শুনুন, আমার ঝোলায় রঙ তুলি কাগজ নেই।'

'নেই?' থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে আমার দিকে তাকালেন। ভ্রূকুটি চোখে অবাক জিজ্ঞাসা, 'তা হলে কী আছে?'

সত্যি লজ্জা পেয়ে গেলাম। বিব্রত হেসে বললাম, 'নিত্য ব্যবহারের কিছু সামগ্রী।'

'অ! তুমি ছবি আঁকতে আসনি?' মহাশয়ের স্বরে হতাশার সুর, 'শুধু গ্রামে বেড়াতে এসেছ?'

নিজেকে নিতান্তই দীন মনে হলো। কুণ্ঠিত হেসে বললাম, 'এক রকম তাই। তবে আপনি ঐ যে বললেন, প্রকৃতির গভীরে জীবলীলার খেলা, সেটাও দেখবার খুব ইচ্ছে।'

মহাশয়ের ভ্রূকুটি চোখে আলোর ঝিলিক ফুটলো। মুখের খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ির ভাঁজে হাসি বিস্তৃত হলো। খুশির সুরে বাজলেন, 'অ, তুমি খালি দেখে বেড়াও?'

'আঁজ্ঞে—।'

'রাখো কোথায়?' চোখের পাতা নিবিড় হলো। মুখের হাসিতে যেন দুষ্টুমি ভরা।

কী জিজ্ঞাসা হে। জবাব দিতে গিয়ে, কথা খুঁজে পাই না। জবাবটা উনি নিজেই দিলেন। ঢুলুঢুলু চোখ আমার চোখে রেখে, নিজের বুকে-বুড়ো আঙুল ঠেকালেন। তর্জনী ছোঁয়ালেন দুই ভুরুর মাঝখানে, 'এই তোমার রাখবার জায়গা, তাই তো?'

মুগ্ধ প্রাণের জবাব নেই। তার চেয়ে অধিক আমার বিস্মিত জিজ্ঞাসা। বুকে আঙুল ঠেকানো ঠিক আছে। কিন্তু ভুরুর মাঝখানে তর্জনীর স্পর্শ যেন এক গভীর সংকেত। স্থানটি যে ধ্যানের কেন্দ্রবিন্দু। মাথাটা পেতে দেবো নাকি ধুলা মাটির চটি জোড়ায়?

'বুঝেছি। এস।' হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। পা বাড়ালেন উত্তরে।

ইতিমধ্যে দুই-চার গ্রামবাসী যাতায়াতের পথে, মুখ তুলে আমাদের দেখে গিয়েছে। কালামুখো পিক্ কি? কুহু যাদের স্বরে। তারা তো ডেকে ডেকে গলা চিরে ফেলছে। এদিকে, বুঝতে পারছি, মহাশয় আমাকে গুণ করেছেন। ধন্দ সঙ্গ বরবাদ। চুম্বকের টানের মতোই, তাঁর পিছু নিলাম।

মহাশয়ের কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। পিছন ফিরে দেখছেন না, আমি আসছি কি না। খানিকটা গিয়ে ডান দিকে ফিরলেন। সরু কাঁচা পথের দু ধারে বন শিউলির ঝাড়। গা ঝড়িয়ে নাম না-জানা লতাপাতা নিবিড়। প্রজাপতি উড়ছে বনগাঁদার ঝাড়ে। চৈত্রেও ফুল ফুটেছে। মহাশয় থমকে দাঁড়ালেন। তখনই শিস শুনতে পেলাম। তিনি পিছন ফিরে আমার দিকে তাকালেন। চুপি চুপি ইশারার ভঙ্গিতে হাত তুলে ডাকলেন। ডেকে, দু হাতে বন শিউলির ঝাড় সরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। কী আছে ওখানে? হাত দিয়ে ঝাড় সরিয়ে তাঁর গায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। নাকে মুখে মাথায় মাকড়সার জাল জড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কৌতূহল মাত্রাছাড়া। আবার শিস শোনা গেল। চেনা পাখির শিস। একটি ডানা ঝাপটা দিয়ে ঝোপের মধ্যে উড়ে গেল।

মহাশয় আমার দিকে বালকের মতো খুশি চোখে তাকিয়ে, আঙুলের ইশারায় একদিকে দেখালেন। আমি ঝাড়ের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে, ঝুঁকে উঁকি দিলাম। দেখি,

কুটোকাটি শুকনো লতায় জড়ানো এক পাখির বাসা। তার ওপরে অকুতোভয়ে বসে আছে লাল পাছা কালো বুলবুলি। কালো বুলবুলি অনেক দেখেছি। চিরদিন জানি, এ পাখি বড় ভীরু। কিন্তু এখন দেখছি, সে বড় দুঃসাহসী। মানুষ দেখেও নড়ে না। বরং পাখা দুটো ছড়ানোর মধ্যে, কেমন একটা যুদ্ধংদেহি ভাব। আর গলায় অদ্ভুত ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজ।

শিস দিয়ে যে-পাখি ডাকে, তার গলায় এমন শব্দ কেন? তখনই আর এক বুলবুলি, বাসার কাছে উড়ে এসে বসলো। আর বাসার ভিতর থেকে শব্দ আসছে, কৃষ্ণকলি ফুলের বাঁশির মতো। মৃদু, অস্ফুট, কচি স্বরের পিক্ পিক্ শিস। মাথা আর একটু তুলতেই রহস্য উদ্ধার। ভীরু বুলবুলির এতো সাহসের মর্ম বোঝা গেল। ডিম ফোটা বুকের বাছা আগলাচ্ছে মা। তাই এতো সাহস। সাহস না, রীতিমতো ক্রুদ্ধ সন্দিগ্ধ। ভঙ্গি আক্রমণাত্মক।

'দেখলে?' মহাশয় চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলেন।

পাখির চেয়েও অবাক চোখে তাঁকে দেখলাম। মহাশয়ের নাম কী, করেন কী? কৌতূহল বাড়ে বই কমে না। অচেনা লোককে ডেকে, প্রকৃতির গভীরে জীবলীলার খেলা দেখান। মানুষ তো অনেক দেখলাম। এমন মানুষ তো চোখে পড়েনি। আমিও প্রায় চুপি চুপি স্বরে বললাম, 'সুন্দর।'

মহাশয় হাতছানি দিয়ে, ঝাড়ের বাইরে গেলেন। আমি আর একবার, বাসার ওপরে ঘাড় বাঁকানো পাখা ছড়ানো বুলবুলিকে দেখে, বেরিয়ে এলাম। মহাশয়ের মাথায়, খোঁচা গোঁফদাড়িতে, বনশিউলির শুকনো ভাঙা পাতা, কুটোকাটি। আমার মাথায় মুখেও নিশ্চয় লেগেছে। মাকড়সার জালে যতো ঝামেলা। হাত দিয়ে মাথায় মুখে বুলিয়ে নিলাম। মহাশয় তাঁর চোখ দুটো বড় করে হাসলেন, 'ভারি মজার ব্যাপার, তাই না? সংসারে কতো কী যে আছে।'

জবাবের প্রত্যাশা না করে, পশ্চিমের পায়ে হাঁটা পথে চললেন। অদ্ভুত মানুষ। দেখে বোঝবার উপায় নেই, এমন সব আশ্চর্য মজার ব্যাপার দেখে বেড়ান। এসব মজার রস পেলেন কোথায়? আর চললেনই বা কোথায়? আমি যাবো কি না বুঝতে পারছি না। অথচ আমাকে গেঁথেছেন মোক্ষম। কৌতূহল বাড়তেই থাকে। ছেড়ে যদি চলে যান, বলার কিছু নেই। কৌতূহল নিয়ে চলে যাবো। কিন্তু ডুমুরদহের বনশিউলির ঝাড়ে, তাঁর বুলবুলির মাতৃলীলা দেখানো ভুলবো না।

'কী হলো? এস।' মহাশয় খানিকটা গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন, 'একবার পাড়ার মধ্যে যাবে না? গঙ্গার ধারে?'

তিনি ডাকলেই যাই। ডাক পেয়েই, পা চালিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। প্রায় বোকার মতোই জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি বুঝি এ-সব দেখে বেড়ান?'

'অকম্মার আর কাজ কি বল?' মহাশয় হেসে বাজলেন, 'এখন বাতিলের খাতায় নাম উঠেছে। কলকাতায় একটা চাকরি করতাম, অনেক আগে। পোষায়নি, তাই

ছেড়ে দিয়েছি। ধর্মে মন দিয়েছিলাম। তা সেটা বোধহয় ভগবানের ইচ্ছে নয়, ধর্মে মন বসেনি। তাই এসবই দেখে বেড়াই।'

এর পরে হয়তো জিজ্ঞেস করা উচিত, তাঁর দিন চলে কেমন করে। কিন্তু ভদ্রতা বলে একটা কথা আছে। দিন চলার কথাটা এতো সহজে জিজ্ঞেস করা যায় না। তবে, সাহস করে জিজ্ঞেস করে ফেললাম, 'এ সবে বুঝি মন বসে?'

'টানে।' মহাশয়ের হাসিমুখে কৌতুকের ছটা।

ছোট কথা। মাপে অগাধ। মনটা মজে গেল। চোখে তাঁর কৌতুকের ছটা দেখে বুঝলাম, ঐ টানেই তিনি মজে আছেন। অথবা বলতে চাইলেন, ওটিই তাঁর ভগবানের ইচ্ছা। প্রকৃতির গভীরে জীবলীলার খেলা দেখেন।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। কাছেই কোথায় ধুপ্ ধুপ্ শব্দ হচ্ছে। মহাশয় ডান দিকে আঙুল তুলে দেখালেন। তাকিয়ে দেখি, সেই ধুপ্ ধুপ্ শব্দের ঘর। মাথায় খড়ের চাল, চারদিক খোলা। লাল শাড়ি, নীল শাড়ি, দুটি তরুণী। পিছন ফিরে ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে। একজন ডান হাতে, একজন বাঁ হাতে, পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরে আছে। সামনে বাঁশের খুঁটির চৌকাঠ। বাকি দু হাত দিয়ে দুজনে বাঁশ ধরে রেখেছে। ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার তালে, তাদের শরীরে যেন নাচের ছন্দ। মাথায় তাদের ঘোমটা নেই। বাসি খোঁপার ফিতে আলগা। একজনের রঙ কালো। আর একজনের মাজা মাজা ফরসা। দুজনে মুখোমুখি তাকিয়ে কী যেন বলছে। আর হাসছে। ঢেঁকির সামনে যে চেলে দিচ্ছে, তাকে দেখা যাচ্ছে না। সামনের ঝাড়ালো গাছটার উঁচু ঝোপে, কুউ-উ-কু-উ-উ···। ঝরা পাতা উড়ছে।

আমি মহাশয়ের মুখের দিকে তাকালাম। মহাশয়ের চোখে কৌতুকের ছটা। মোটা ভুরু নাচিয়ে, নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন?'

বুলবুলির বাচ্চা দেখার মতোই চুপি চুপি বললাম, 'অপরূপ!'

মহাশয় আমাকে হাতছানি দিয়ে, পা বাড়ালেন। আমি আর একবার দুই তরুণীর ঢেঁকি পাড়ের নাচের ছন্দ দেখে, তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনি এবার গলা খুলে বললেন, 'যামিনী রায়ের জ্যান্ত মডেল, তাই না? এরকম জোড়া মেয়ের ঢেঁকি পাড় দেওয়া এঁকেছেন কি না জানি নে। সেদিন যে ছেলেটা রঙ তুলি নিয়ে এসেছিল, সে বেচারি এমন সাবজেক্ট পায়নি।'

আমার আক্কেল গুড়ুম ঠকাস! মহাশয়ের মুখে যামিনী রায়ের নাম? গ্রামের নাম ডুমুরদহ। আমার চোখে অজ পাড়া গাঁ ছাড়া আর কিছু না। সামান্য ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি। নিতান্ত এক চালচুলোহীন গ্রাম্য মানুষের মতো। যামিনী রায় এমনটি এঁকেছেন কি না জানেন না। কিন্তু তাঁর জ্যান্ত মডেল দেখিয়ে দিলেন। এ নজরের আয়তন কতো দূর? মহাশয়ের বিচরণের ক্ষেত্রই বা কতোখানি? কতো রাজপথে আর অলি গলিতে? অবিশ্যি প্রকৃতির গভীরে যিনি জীবলীলার খেলা দেখেন, তাঁর নজর বিচরণের মাপ করতে যাওয়াটাই বেয়াকুফি। ভাগ্যিস,

কোনোরকম খাপ খুলতে যাইনি! আমার স্ব-ভাবেও সেটা নেই। কিন্তু এ যে অপ্রত্যাশিত। চরণে মাথা ঠুকবো নাকি?

সাহস হয় না। এ সব মানুষের মর্জি বোঝা ভার। কেবল কৌতূহলই বাড়তে থাকে। দ্বিধা কাটিয়ে বলি, 'আমারও ঠিক জানা নেই, যামিনী রায় এমন ছবি এঁকেছেন কি না। কিন্তু মনে হচ্ছে, ছবিটা চেনা।'

'কেন এমন মনে হলো বলো তো?' মহাশয়ের চোখে কৌতুকের জিজ্ঞাসা। চলতে চলতে ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

কিন্তু কেন এমন মনে হলো, তা তো জানি না। অতএব সরল স্বীকারোক্তি, 'তা জানি নে।'

'জানো, মনে করতে পারছো না।' মহাশয় হেসে হেসে বাজলেন, 'ঐ ওরা যারা ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে, ওদের তুমি অনেক জায়গায় অন্য কাজে দেখেছো। মাঠে ঘাটে নানা কাজে। তাই চেনা চেনা মনে হয়েছে।'

চিন্তার কি ঐশ্বর্য! আবেগ সামলাতে পারলাম না। বললাম, 'আপনার দৃষ্টি—'

'উঁহু! হাত তুলে থামিয়ে দিলেন আমাকে, 'শক্তি টক্তি বলো না। নজরটা কেড়ে নেয়। মনটা ভরে যায়।'

অথচ এমন নজর ক'জনের কাড়ে? দৈনন্দিন জীবনযাপনের এমন একটা সামান্য ছবি, ক'জনের মন ভরিয়ে দেয়? বলি, মহাশয়, দরজা খুলুন। খুলেছেন যখন, আর একটু খুলুন। আপনাকে প্রাণ ভরে দেখি। নিজেই একটু দরজায় হাত দিয়ে ঠেলি। জিজ্ঞেস করি, 'আপনার কি রঙ তুলিতে— ।'

'উঁহু উঁহু—।' মহাশয় ঘাড় নাড়লেন, 'কোনোদিন হাত দিইনি। ঐ নজরেই টান। তুলির টানে ধরতে শিখিনি। সৃষ্টিকর্তার সগোত্র হওয়া কি সহজ কথা। রঙ তুলিওয়ালারা তো তাই। ওঁরা ঈশ্বরের সগোত্র। তোমার মনে হয় কি কখনো?'

তাঁর মতো মনের ঐশ্বর্য আমার নেই। পুরনো কথাই নতুন করে শুনছি কি না' ঠাহর হয় না। কিন্তু আমার কানে একেবারে নতুন। মুগ্ধ বিস্ময়ে বলি, 'আপনার মতো ভাবতে শিখিনি।'

'এটা শেখার বিষয় নাকি?' মহাশয় মোঁটা ভুরু কাঁপিয়ে, দুষ্টু ছেলের মতো হাসলেন, 'দেখলেই তো মনে আসে। মনে করো, সেই দা ভিঞ্চি থেকে রবি ঠাকুর— অ্যাঁ? মনে আসে না, সব তাঁরই সগোত্র?'

এখানে জবাব অপ্রয়োজন। দরজা খুলছে। চুপ করে থাকো। কিন্তু আমার বুকের কোথায় ফাটছে। মুখে ফুটছে না। মানুষের আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষাটা বুদ্ধিজাত না। প্রবৃত্তিজাত। দশটা শিশুকে খেলতে দেখলে, অপুষ্ট দুর্বল শিশুটিরও প্রাণে ঢেউ জাগে। ওটা বুদ্ধি বিবেচনা না। শিশু-প্রবৃত্তি। আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা। তবে কী না, এই মানুষে, সেই মানুষ আছে। নির্ভয়ে খেলতে নেমে যাওয়া যায়। আমার মুখ ফুটলো, 'এখন মনে হচ্ছে, রঙ তুলি কাগজ নিয়ে বেরোলেই ভালো হতো। অনভ্যাসে হাতটা ইদানীং আড়ষ্ট। এক সময়ে সচল ছিল।'

মহাশয় দাঁড়িয়ে পড়লেন। ডাগর গভীর চোখে ভ্রূকুটি দৃষ্টি। আমার চোখে চোখ। গতিক কেমন? বেজায়গায় হাত দিয়েছি। উনি হা হা স্বরে বাজলেন, 'বুঝেছি। একটা গোলমাল কোথাও না থাকলে, এভাবে কেউ গ্রাম বেড়াতে বেরিয়ে পড়ে? তুমি কি ভেবেছো, গায়ে পড়ে এমনি এমনি তোমাকে মজা দেখিয়ে বেড়াচ্ছি? ইস্টিশন থেকে নামলে। পায়ে পায়ে এদিকে এলে। আমি তোমার পেছনে পেছনে। ভাবি, অচেনা মুখ ছেলেটা আশ্রমের সামনে দাঁড়িয়ে কী দেখছে?'

আমি অবাক প্রশ্ন করি, 'আশ্রম?'

'হ্যাঁ, ঐ যেখানটাতে প্রথম দাঁড়িয়েছিলে, ওটা আশ্রম। উত্তমাশ্রম।' মহাশয়ের চোখের গভীরে যেন চিকচিক বিজলি ঝিলিক, 'তারপরে আওয়াজ দিয়েই টের পেলাম, এটা একটা ঠিকানা খোয়ানো ছেলে।'

আরও অবাক জিজ্ঞাসা করি, 'ঠিকানা খোয়ানো?'

'হ্যাঁ, ঠিকানা খোয়ানো। বেয়ারিং চিঠি না।' মহাশয় আবার হা হা স্বরে বাজলেন, 'দ্বিগুণ পয়সা দিয়ে নিতে হবে, বা ফেরত দিতে হবে, সেরকম না। ঠিকানা খোয়ানো। আর ঠিকানা যারা খুইয়েছে, তাদের চোখেই ঐ রঙটা আছে।' বলে তর্জনী তুলে আমার চোখের দিকে দেখালেন। তারপরেই ভ্রূকুটি নজর বিঁধিয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা, 'এক সময়ে সচল ছিল, মানেটা কী? তোমার আবার এক সময়, দুই সময় কিসের, অ্যাঁ? সবে তো ফুটেছে ধন, এর মধ্যেই, ইদানীং হাত আড়ষ্ট আবার কী? হাতের জাম ছাড়াও। দেখবে, চালালেই চলবে।'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই, একটা কুকুর তেড়ে এলো ঘেউ ঘেউ করে। মহাশয় মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, 'অ! এর আবার কর্তব্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। থাম বাবা, থাম। এসো, বসে কথা বলি।'

সামনেই দেখতে পাচ্ছি, গৃহস্থের খড়ের ঘরের চাল। মাটির দেওয়ালের আড়াল। গাছপালায় নিবিড় ছায়া। কালামুখোর ডাক আর থামে না। বাতাসে ঝরা পাতার দৌড়ঝাঁপ। মহাশয় যতো এগোন, সারমেয় ততো পেছোয়। কিন্তু ডাকতে ছাড়ে না। আর তার লক্ষ্য মহাশয় না, আমি। সে মহাশয়কে পাশ কাটিয়ে আমাকেই তাড়া করতে চায়। আমি ভয়ে ভয়ে একেবারে মহাশয়ের গায়ে গায়ে। আর উনি সান্ত্বনা দিচ্ছেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। নেমকহারামি জানিস নে। এখন একটু চুপ কর বাবা। এস হে।' আমাকে ডেকে তিনি মাটির দেওয়ালের পাশ দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকলেন।

অনুমান করলাম, মহাশয়েরই গৃহ। কিন্তু তিনি গলা তুলে ডাকলেন, 'গোবিন্দ আছ নাকি? কৈলাস কোথায়?'

গৃহরক্ষী সারমেয়র ডাকের কামাই নেই। তার মধ্যেই পুরুষ স্বর শোনা গেল, 'আসুন দাদাঠাকুর।'

'তোমার ঐ কেলো না ভুলো, ওকে একটু থামাও ভাই।' মহাশয় বললেন। আমার দিকে ফিরে, হাতছানি দিলেন।

এ তা হলে মহাশয়ের গৃহ না? ভিতরে ঢুকে দেখি, দুই পাশে উঁচু দাওয়া ঘর। মাঝখানে গোবর মাটি দিয়ে নিকানো পরিচ্ছন্ন উঠোন। উঠোনের এক পাশে কিছু ধান রোদে দেওয়া হয়েছে। কাছ ঘেঁসে কিছু খোসা শুদ্ধ সুপরি। আমরা ঢোকবার মুখেই, এক ঘর থেকে উঠোন পেরিয়ে আর এক ঘরে যাচ্ছিল বাড়ির বধূ। এক পলক ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, ঝটিতি মাথার ঘোমটা টেনে বাড়িয়ে দিল। পুবের দিকে খোলা। কয়েকটা নারকেল সুপুরি গাছের ফাঁক দিয়ে নদী দেখা যায়। রোদ এসে পড়েছে উঠোনে। উঠোনের দক্ষিণে বাঁশের খুঁটিতে বড় একটা মাছ ধরার জাল শুকোচ্ছে। ডান দিকের ঘরের ছেঁচতলায় একটা বৈঠা। গোবিন্দ বা কৈলাস, যে-ই হোক, খালি গা, গুটিয়ে পরা ধুতি। হাতে তার জাল বোনার সুতো আর কাটি। পাশে দাঁড়িয়ে একটা ল্যাংটা ছেলে। সে-ই তাড়া করলো কুকুরটিকে, 'হেই ভুলো, মারব স্‌সালা!'

দু ফুট উঁচু ল্যাংটা শিশুর তাড়া খেয়ে, ভুলো নেমে গেল পুবের ঢালুতে। প্রতাপ আছে বলতে হবে। মুখের বচনও জব্বর! 'স্‌সালা' উচ্চারণটি স্পষ্ট। গোবিন্দ বা কৈলাসের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আমার দিকে। আপ্যায়ন করে দাদাঠাকুরকে, 'বসুন, দাওয়ায় উঠে বসুন। দুটো আসন পেতে দাও গো।' ঘরের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিয়ে আমাদের কাছে এগিয়ে এলো।

'আসন লাগবে না গোবিন্দ, দাওয়াতেই বসা যাবে।' মহাশয় আমার দিকে তাকালেন। আমার জামা কাপড়ের দিকেও। তারপরে বললেন, 'এই বাবুটির জন্য একটা আসন দাও। গাঁয়ের অতিথি, বিদেশি মানুষ, পাট ভাঙা জামা কাপড়।'

বাবু বলে উপহাস করছেন না তো? লজ্জায় আর অস্বস্তিতে বললাম, 'আমার আসন দরকার নেই।'

দরকার যাদের, তারা নিজেদের কাজ করে যায়। ঘরের ভিতর থেকে একটি কিশোরী বেরিয়ে এসে দাওয়ার ধারে দুটো আসন পেতে দিল। চটের গায়ে রঙীন সুতোর নকশা করা আসন। কেবল তো বসতে দেওয়া না। হাতের কাজের শিল্প প্রদর্শনও বটে। মহাশয় বললেন, 'এ ছোকরাবাবু ছবি আঁকতে আসেননি, গাঁ দেখতে এসেছেন। একটু চা খাওয়াবে তো গোবিন্দ?'

গোবিন্দ লোকটির বয়স চল্লিশ হতে পারে? কালো শক্ত-পোক্ত শরীর। মাথায় ঘন কালো চুলে, দুই-চার রূপোলি ঝিলিকটা তাই বেশি চোখে পড়ে। হাসতে গেলে, গাল কুঁচকে যায়। বললো, 'তা খাবেন। আগে বসেন তো। তা এত সকালে...এই বাবুকে আনতে গিছলেন নাকি?'

'বাবুকে আনতে? কোথা থেকে?' মহাশয় ভ্রূকুটি চোখে একবার দেখেন আমাকে, আবার গোবিন্দকে।

গোবিন্দ বললো, 'ইস্টিশন থেকেই হবে বোধকরি?'

'বাবু কারোর আনা নেওয়ার মানুষ নয়।' মহাশয় হেসে বাজলেন, 'নিজের

থেকেই এসেছেন। আমি আসছিলাম পশ্চিমের পঞ্চুর বাড়ি থেকে। পঞ্চু কাল নেমন্তন্ন করে রেখেছিল কি না, তাই।'

গোবিন্দর চোখে কৌতুকের ঝিলিক, গালে হাসির ভাঁজ। একবার আমাকে দেখে নিয়ে বললো, 'সকালের রস বেশ টাটকাই ছেল তা'লে?'

'উঁম!' মহাশয় ভ্রূকুটি চোখে তাকালেন আমার দিকে। তারপরে গোবিন্দর দিকে ফিরে বললেন, 'তা চোত্ মাসের সকালের তালের রস কি বাসি হবে? ও তো তাড়ি নয়, নীরা। বাখর মশলা কিছু মেশানো হয়নি। তবে বেশি খাইনি। এক কলসী।'

তা হলে আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়টি নেহাত ভোঁতা না। মধু মাসে মধুর গন্ধটা ঠিকই পেয়েছিলাম। মধুতে কিঞ্চিৎ বাসিরসের গন্ধ মনে হয়েছিল। এখন বুঝলাম, বাসি না, রস টাটকা। কিন্তু এক কলসী! পেটে এতো জায়গা কোথায়? থাকে। সবাই সব জানতে পারে না। তবু বলতে হবে, ঈষৎ লাল চোখে ঢুলুঢুলু নজরে, তাঁর প্রকৃতির গভীরে জীবলীলা দেখতে ভুল হয়নি। বরং ভাবের ঘরটি খাসা আছে।

গোবিন্দ বললো, পঞ্চু মণ্ডলের পেরাণটি দরাজ। নিজে খেতে ভালবাসে, পরকে খাওয়াতেও ভালবাসে।'

'ভালবাসা ঐরকম।' মহাশয় গোবিন্দর কৌতুকহাস্য দেখলেন না। আমাকে বললেন 'বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?' বলে নিজেই আগে বসলেন।

আমি দাওয়ায় উঠে তাঁর পাশের আসনে বসলাম। এমন সময়ে পুবের ঢালু থেকে, ভেজা কাপড় গায়ে জড়িয়ে উঠে এলো এক রমণী। তারুণ্যের দীপ্তি তার শরীরে। উঠে আসছিল আনমনে। হঠাৎ দাওয়ায় আমাদের দেখেই ঠেক। নিজেকে সামলাবার আর সময় ছিল না। এক দৌড়ে, অন্য ঘরের পিছনে অদৃশ্য হলো। মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কৈলাস কোথায়?'

'ভুতো কেষ্টকে নিয়ে জাল তুলতে গেছে।' গোবিন্দ জাল বুনতে বুনতে জবাব দিল।

মহাশয় বললেন, 'তা হলে চা হোক, আমি এর সঙ্গে একটু কথা বলি।' আমার দিকে ফিরে বললেন, 'কথার আগে নাম কামটা জেনে নিই?'

নাম বললাম। কামেই ঠেক। মহাশয়ের ডাগর চোখে ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসা। কী জবাব দেবো, বুঝতে পারছি না। উনিও চোখ সরান না। দেখছি গোবিন্দরও কান খাড়া। শেষ পর্যন্ত মুখ খোলবার উদ্যোগ করতেই, মহাশয়ের সেই মুখ থাবাড়ি হাতের ভঙ্গি, 'থাক, আর বলতে হবে না। আমি পত্রপত্রিকার পাতা ওলটাই হে।' তারপরেই আমার একটা হাত ধরে, কয়েক পলক মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। থাকতে থাকতেই হঠাৎ হা হা স্বরে বেজে উঠে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'অ গোবিন্দ, তোমার ঘরের অতিথি বড় এলেমদার হে। শুধু চায়ে হবে না, কিছু খাবার ব্যবস্থা কর।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'না না, খাবার দরকার নেই।'

'তুমি চুপ কর।' মহাশয় বেশ হুকুমের সুরে বললেন, 'খাবার কি আর এ ঘরে

ক্ষীর ননী পাবে? মুড়ির সঙ্গে পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা। তারপরেই আবার আমার মুখের দিকে ভ্রূকুটি নজর, 'বলতে হয়, অ্যাঁ! তাই ভাবি, এই সাতসকালে কার ঘাড়ে এমন ভূত চাপে, গ্রাম বেড়াতে বেরোয়? কথাটা তা হলে ঠিকই বলেছিলাম, অ্যাঁ? ঠিকানা খোয়ানো ছেলে। এসে পড়েছে ডুমুরদয়। আর পড় তো পড় আমারই চোখে।'

গোবিন্দর জাল বোনা হাত থমকে ছিল। চোখে বিভ্রান্তি, 'ঠিকানা খোয়ানো মানে কি দাদাঠাকুর?'

'যার কোনো ঠিকানা নেই, সে-ই ঠিকানা খোয়ানো।' মহাশয়ের খোঁচা গোঁফদাড়ির হিজিবিজি মুখে হাসি। চোখে সেই কৌতুকের ছটা, 'বুঝলে গোবিন্দ, এ হারিয়ে গেছে।' আমার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালেন।

গোবিন্দর ধন্দ কাটে না। জিজ্ঞেস করে, 'আপনার কথা তো কোনোদিন বুঝতে পারিনে দাদাঠাকুর। বই পড়ে পড়ে, কথা সব চালে খুদে এক। উনি কী কাজ করেন, সেটা তো বুঝলাম না।'

'তোমাকে কী বলে বোঝাবো বলো তো গোবিন্দ, অ্যাঁ?' মহাশয় আমার দিকে তাকালেন, 'কী' তুমি কী কর বলো তো? তুমি সেটেলমেণ্ট অফিসের বাবু কি? না কি রেজিস্ট্রি অফিসের আমিন?'

এ রহস্য জিজ্ঞাসার জবাব আমার জানা নেই। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে, বিব্রত হয়ে হাসি। মহাশয় মজা পেয়ে, হেসে বাজেন। বলেন, 'গোবিন্দ, এ লেখে।'

গোবিন্দর বিভ্রান্ত জিজ্ঞাসা, 'লেখেন?'

'হ্যাঁ, লেখে। ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আর লেখে।' মহাশয়ের চোখে তেমনি কৌতুকের ছটা, 'বুঝলে গোবিন্দ, এ বই লেখে। তোমার কথাও লিখবে। কী, লিখবে না?' ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকান।

কী জবাব দেবো, ভেবে পাই না। গোবিন্দর মুখের দিকে তাকাই। ধন্দটা পুরোপুরি কাটেনি। কিন্তু মুখে যুক্ত দন্ত হাসি। আমি দূরের গঙ্গার দিকে একবার দেখি। জোয়ার ভাঁটা বুঝতে পারি না। চৈত্রের গঙ্গার রুপোলি স্রোতে, ইস্পাতের ঝলক। আবার মুখ ফিরিয়ে তাকাই মহাশয়ের মুখের দিকে। তিনি তৎক্ষণাৎ হাত তুলে, আমাকে নিষ্কৃতি দিলেন, 'বলতে হবে না। বুঝেছি। সংসারে সব কথার জবাব মেলে না। ভাবের কথা, ভাবের ঘরে, ব্যক্ত করা যায় না।'

এই সময়ে সেই কিশোরীর আবির্ভাব। অচেনা লোক দেখেই বোধ হয়, গায়ে এখন ধোয়া ডুরে শাড়ি। আমাদের সামনে নামিয়ে দিল, মুড়ি ভরতি বড় এলুমিনিয়ামের থালা। তার সঙ্গে আস্ত কাঁচা লঙ্কা আর কাটা পেঁয়াজের টুকরো। উঠোনের ওধারের ঘরের দাওয়ায় এক বধূ। লালপাড় শাড়ির ঘোমটা তোলা মুখ। চোখে অবুঝ কৌতূহল। আমি তাকাতেই ঘোমটায় টান। পিছন ফিরে ভিতরে গমন। নিকানো উঠোনে ইতিমধ্যে কয়েকটা উড়ে আসা ঝরা পাতা। উত্তরের চালের কাছে, সজনের ডালে চড়ুইয়ের ঝাঁক। কালামুখোদের কুহু গাঁয়ের আকাশ জুড়ে।

'খাও হে। খাও, কথা আছে অনেক।' মহাশয় নিজেই আগে মুঠো-ভরতি মুড়ি মুখে পুরলেন।

যে-কথার জবাবটা তাঁকে দিতে পারিনি, সেই জবাবটাই নিজেকে দিচ্ছিলাম। তিনি কাগজপত্র ঘাঁটা মানুষ নিঃসন্দেহে। না হলে নাম শুনেই এমন অখ্যাতকে ঝটিতি চিনতে পারতেন না। কিন্তু সেটা তাঁর বড় পরিচয় না। তিনি আমাকে প্রকৃতির গভীরে জীবলীলার খেলা দেখিয়েছেন। দুটি চিত্র। ভোলবার না। তবু মন নিরন্তর স্রোতে ধায়। পলি পড়ে। সময়কে অবজ্ঞা করি, এমন সাহস। নেই। হয়তো কোনোদিন সেই স্মৃতির ঝাপটায় পলি ধুয়ে যাবে। তখন ডুমুরদহের কোনো কথা না লিখি, তাঁর কথা লিখবো।

মহাশয় আমার ডান হাতটা টেনে, মুড়ির থালায় গুঁজে দিলেন। আমি হেসে মুড়ি নিলাম মুঠো করে। তিনি বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। গোবিন্দ এগিয়ে এসে, গম্ভীর মুখে বলল, 'দাদাঠাকুর, বই লিখলে তো সবাই পড়বে?'

'তা যাদের পড়ার তারা পড়বে।' মহাশয়ের চোখে ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসা।

গোবিন্দ একটু হাসবার চেষ্টা করলো। তারপরেই আবার মুখ শক্ত, 'তা হলে বাবুকে বলে দিন, শরৎ দাস যে আমার মরা বাপের অতবড় বিন্ জালটা আকোচে কেটে দিয়েছিল, সেটা যেন লিখে দেন, হ্যাঁ।'

মহাশয় তাকালেন আমার দিকে। আমিও দেখলাম তাঁকে। তিনি আবার তাকালেন গোবিন্দর দিকে। গোবিন্দর মুখে এখন আড়ষ্ট হাসি। আমার দিকে একবার দেখে, মহাশয়কে আবার বললো, 'আর গত সনে, তিন দিনের জ্বরে ছোট মেয়েটা মারা গেল, সেই কথাটাও।'

মহাশয় আবার তাকালেন আমার দিকে। এখন তাঁর কপালে ভ্রূকুটি নেই। ডাগর চোখে অবাক ব্যগ্র জিজ্ঞাসা। গোবিন্দর কথাগুলো কানে ভাসছে। তার প্রত্যাশাভরা দৃষ্টি আমার দিকে। মুখটা হাঁ করা। লিখে দেবার জন্যে দুটো কথা তার মনে এসেছে। একটা, হারানোর ক্ষোভ। আর একটা শোক। পর পর দুটো হারানোর কথাই কেন মনে এলো, সেই জবাবটা তার চোখে খুঁজছি। মূলে হয় তো চোখে নেই। ঐ দুটোই মনে গেঁথে আছে। মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'লিখবো।'

'লিখবে।' মহাশয় গোবিন্দকে বললেন। আবার আমার দিকে ফিরে তাকালেন। ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের?'

'জীবলীলার খেলাটা কেমন?' যেন সেই চুপিচুপি স্বরেই জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম, 'বিচিত্র।'

মহাশয় হেসে বাজলেন, 'চিবোও, মুড়ি চিবোও দেখি।' নিজে মুঠি করে মুড়ি নিয়ে মুখে পুরলেন। চিবোতে চিবোতে বললেন, 'এবার তোমার সেই কথাতে আসি। অনভ্যাসে হাত সরে না বলছিলে? তা দেখ, এই ডুমুরদ গ্রামটায় একটু ধর্মের

ভাব বেশি। পাশে দেখলে উত্তমাশ্রম। ঐ আশ্রমের কল্যাণে এ গ্রামের উন্নতি। অনেকের সাধন লাভ হয়েছে। এখন আছেন বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী। পারো তো একবার দেখা করে যেও।'

নাম শুনেই এক স্বভাব কবি বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল। দেখা হলেই, ঠাকুরের নামে কবিতা বলে। বললাম, 'শুনেছি।'

'তিনিও এই গ্রামের মানুষ'। মহাশয় বললেন, 'কিন্তু তোমাকে তো আগেই বলেছি, ভগবানের বোধহয় ইচ্ছে নয়, আমি ধর্ম নিয়ে থাকি। নইলে, কাকে গু না খেতে পঞ্চু মণ্ডলের বাড়ি রস খাবার নেমন্তন্ন রাখতে যায় না।' হা হা হাসিতে বেজে উঠেই, আবার মুখে এক মুঠো মুড়ি। আর চিবোতে চিবোতেই, মুখের মুড়ি বাগে এনে জিজ্ঞেস করলেন, 'রবিঠাকুরে ভক্তি কেমন?'

আমি মুড়ি গিলে, বলে ফেললাম, 'তেমন নেই। প্রেমে আছি।'

'অ বাবা। আমাকেও খেলা দেখাচ্ছো?' মহাশয় আমার হাঁটুর ওপরে একটা আলতো চাপড় মারলেন, 'আসল কথাটা বলেছো। জীবনে একবার তাঁকে দেখেছিলাম। অই—উইখানে।' হাত তুলে দেখালেন গঙ্গার উত্তর-পুবে।

একটু কেমন ধন্ধ লেগে গেল। তাঁর হাতের নিশানায় আমিও তাকালাম। যতো দূরে দেখালেন, দৃষ্টি সেখানে যায় না। গাছের আড়ালে আটকে যায়। জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর ঈষৎ লাল ঢুলুঢুলু চোখের দিকে তাকালাম।

'হ্যাঁ! গঙ্গার ওপারে। এটা হলো কতো?' মহাশয় এক মুহূর্ত চোখ বুজলেন। আবার খুললেন, 'নাইনটিন ফিফটি ফাইভ। সেটা ছিল থার্টি থ্রি অক্টোবর মাস, রাসের সময়। তুমি কি বিশ্বাস করছো না?'

তাড়াতাড়ি ঢোঁক গিলে বলি, 'আজ্ঞে—।'

'পুরোটা করছো না।' মহাশয়ের চোখে কৌতুকের ছটা, পঞ্চু মণ্ডলের রসের এত ক্ষমতা নেই, সেই সন্ধেটা ভুলিয়ে দেবে। তারিখটা ইস্তক মনে আছে, উনতিরিশে অক্টোবর। এই ডুমুরদর উত্তরে খামারগাছি গ্রাম। সেই খামারগাছির ওপারে তাঁর বজরা নোঙর করেছিল। খবর আমরা পেয়েছিলাম আগেই, যখন তিনি ত্রিবেণীর ঘাট পেরিয়ে আসছেন।' মহাশয় থেমে এক মুঠো মুড়ি মুখে পুরলেন।

আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। নিজেকে ধিক্কার। মহাশয়কে এক মুহূর্তের জন্য ভুল বুঝেছিলাম।

তা বাইশ বছর আগের কথা। আমার বয়স তখন তোমার মতন হবে। কমও হতে পারে কিছু।' মহাশয় মুখেব মুড়ি তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করলেন, 'কয়েকজনের সঙ্গে আমিও নৌকোয় করে ওপারে গেলাম। বজরার গায়ে গিয়ে নৌকো ভিড়লো। উনি তখন ভিতরে। খবর গেল। বললেন, দেখা হবে না। তা বললে কি হয়? বুকের ওপর দিয়ে চলে যাবেন, দেখা পাবো না? উপরোধে গেলায় ঢেঁকি। কী আর করেন? বজরায় ডাকলেন। দেখি গায়ে একটা কালো জোব্বা। আমার মনে তখন বিস্তর

কথা। ভুলে গেছলাম, বিস্তর কথার ধারে কাছে উনি নেই। আমাদের ক্লাব লাইব্রেরির কথা শুনে, একখণ্ড কাগজে নিজের নামটি সই করে, নিচে ডুমুরদ লিখে তারিখ বসিয়ে দিলেন। সেটা এখনো গাঁয়ের লাইব্রেরিতে রাখা আছে। কিন্তু আমি শুধু চেয়ে দেখলাম, একটা কথাও মুখে ফুটলো না। শুনলাম, উনি শান্তিপুরে যাচ্ছেন। ঐ বয়সে শান্তিপুরের রাস দেখতে কী না, তা জানিনে।' কথা থামিয়ে মুড়ি মুখে পুরলেন।

আমি মহাশয়ের মুখের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছি। ঐ দেখাটা আমার জীবনে কখনও হয়নি। মহাশয় বললেন, 'ঘটনাটা ওখানেই শেষ। ধর্মে আমার মন বসেনি, কিন্তু মনটা অন্যদিকে টানতো। রবিঠাকুরের কোনোকিছুই ভোলবার নয়। তবে দুটো ব্যাপার আমাকে চিরদিন বড্ড ভাবিয়েছে। একটা কথা তিনি এক সময় বলেছিলেন, "আমাকে যদি কেউ বলে, তোমাকে দুটোর একটা হারাতে হবে, দৃষ্টি অথবা শ্রুতি। আমি বলবো, দৃষ্টি ছাড়তে পারি, শ্রুতি, নয়।" যদ্দুর মনে পড়ে প্রমথনাথ বিশীর কোনো লেখায় কথাটা পড়েছিলাম। তারপরে অনেক দিনে-রাত্রে চোখ বুজে, কান পেতে থেকেছি। তাঁর মতো করে বুঝতে পারিনি, শব্দের কি মহিমা। কিন্তু অবাক হয়ে অনেক গান শুনেছি।'

ডুমুরদহ গ্রামে, সম্ভবত এক মৎস্যজীবীর ঘরের দাওয়ায় বসে আছি। সামনে আমার একব্যক্তি। এখনও তাঁর নাম জানি না। দেখলে মনে হয় চালচুলোহীন ছন্নছাড়া। পঞ্চু মণ্ডলের তালের রস পান করে এসেছেন। এখন চোখ বুজে আছেন। রবিঠাকুরের দৃষ্টিহীন শব্দের কথা বলেন। কিন্তু কী গান তিনি শুনেছেন? জিজ্ঞেস করি, 'গান?'

'হ্যাঁ, গান।' মহাশয় মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'সে-গানের তাল আছে, লয় আছে, মান আছে। একেবারে সুরে বাঁধা। শুনেছো কোনোদিন?' চোখ মেলে তাকালেন।

শুনেছি কি? সংশয়ের চোখে তাকিয়ে থাকি। স্থান কাল ভুলে যাই। মনে হয়, কী ধ্বনি যেন কানে বাজে। মহাশয়ের চোখে কৌতুকের ছটা, 'শুনেছো, মনে করতে পারছো না। না শুনলে লিখতে পারতে না। রবিঠাকুরও পারতেন না। ধ্বনি ছাড়া কাব্য হয় না। তাই ঐ কথাটা কখনো ভুলতে পারি নে। আবার আর একটা উল্‌টো উৎপত্তি দেখ, শেষ বয়সে তাঁর ছবি আঁকা। কোথা থেকে কোথায়! সারা জীবন অক্ষরে লিখে, শেষে রঙ তুলি ধরেছিলেন। তোমাদের সেই কি একটা কথা আছে না, পূর্ণতা? পাওয়া যায় কি না, জানিনে বাপু। কিন্তু ওঁর ছবি আঁকার কারণটা বোধহয় তাই, পূর্ণতা। ক্ষ্যাপামি না?'

অবাক হয়ে বললাম, 'ক্ষ্যাপামি?'

'তা নয় তো কী?' মহাশয়ের হিজিবিজি মুখে যেন দুষ্টুমির হাসি, 'ঈশ্বর তো ক্ষ্যাপাই। তবে ঈশ্বর নিজেও পূর্ণ কী না, আমি জানিনে।' মুঠো করে মুড়ি নিয়ে মুখে পুরলেন। কচ্‌কচ্‌ করে পেঁয়াজ চিবোলেন।

আমি তাজ্জব হয়ে মহাশয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। রবিঠাকুরের নামেই

ভর হয়, এমন প্রেমিক অনেক দেখেছি কলকাতায়। ঠাকুরের ভর হলে, অনেক আড় মাতাল-কথা শোনা যায়। কিন্তু এমন প্রেমিক দেখিনি। তাও এক পাড়াগাঁয়ের, গৃহস্থের দাওয়ায় বসে।

'আর তুমি বলছো কি না, অনভ্যাসে হাত আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

আর চলে না?' মহাশয় ভ্রূকুটি চোখে প্রায় ধমক দিলেন, 'খবরদার, রঙের হাত ছেড়ো না। চালালেই চলবে। নাও, মুড়ি চিবোও।'

এই সময়ে কিশোরীটি নেমে গেল দাওয়া থেকে। ওধারের দাওয়ায় ঘোমটা ঢাকা কলাবউয়ের হাতে দুটি কাঁচের গেলাস। খয়েরি রঙের চা থেকে ধোঁয়া উঠছে। কিশোরী গেলাস দুটো এনে আমাদের সামনে বসিয়ে দিল।

মহাশয় জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে, বাপকে দিবিনে?'

'আজ্ঞে আমি এখন আর চা খাবো না।' গোবিন্দ বললো, 'চাড্ডি ভাত খেয়ে খামারগাছির হাটে যাব।'

মহাশয় মাথা ঝাঁকিয়ে, একটা গেলাস তুলে নিলেন। চুমুক দিয়ে আরামের শব্দ করলেন। পকেট থেকে বের করলেন বিড়ি দেশলাই। দেখে, এতক্ষণে আমার নেশাও চাপলো। কিন্তু মহাশয়ের সামনে কি উচিত হবে।

'এ বস্তু চলে?' মহাশয় নিজেই জিজ্ঞেস করলেন বিড়ি দেখিয়ে।

কুণ্ঠিত হেসে বললাম, 'আমার আছে। আপনি অনুমতি দিলে—।'

'অনুমতি?' হা হা স্বরে হেসে বাজলেন, 'পথ চলতে তো তা হলে জনে জনের কাছে তোমাকে অনুমতি চাইতে হবে। নাও, বের কর।'

আমি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করলাম। মহাশয়ের দিকে বাড়িয়ে দিলাম, 'যদি ইচ্ছা করেন।'

'কী, গোবিন্দ, ইচ্ছা কর?' মহাশয় গোবিন্দর দিকে তাকালেন।

গোবিন্দ একেবারে লজ্জায় এতোটুকু। হাসি গালের ভাঁজে। মহাশয় একটি সিগারেট নিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, 'নাও।'

গোবিন্দ এগিয়ে এসে বললো, 'আপনি নেন দাদাঠাকুর।'

'আহা, আগে তুমি নাও।' মহাশয় ধমকে বাজলেন।

গোবিন্দ প্রসাদ নেবার ভঙ্গিতে ডান হাত বাড়ালো। বাঁ হাত ডানের কনুইয়ে। মহাশয় সিগারেট দিয়ে প্যাকেটটি আমাকে দিলেন। দাঁতে কামড়ে ধরলেন বিড়ি, 'যার যাতে মৌতাত। তুমি সিগারেট ধরাও। কিন্তু চা টা ঠাণ্ডা কোরো না।'

আমি সিগারেট না ধরিয়ে চায়ের গেলাসে চুমুক দিলাম। মহাশয় নিজের বিড়ি ধরিয়ে, গোবিন্দর সিগারেটে আগুন ছোঁয়ালেন। আমার মনটা অনেকক্ষণ থেকেই উস্‌খুস করছিল। অচেনা লোককে পথ থেকে ডেকে যিনি প্রকৃতির গভীরে জীবলীলা দেখান, ডেকে এনে বসান চেনা গৃহস্থের দাওয়ায়, রবিঠাকুরের শ্রুতি আর ছবি আঁকা যাঁকে ভাবায়, তাঁর পরিচয়টা এখনও পাইনি। চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে গলা

খাকারি দিলাম। বললাম, 'আপনার পরিচয়টা কিন্তু এখনো পেলাম না।'

'আমার পরিচয়?' মহাশয় বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে অটুট দাঁতে অবাক হাসলেন 'এখনো চিনতে পারোনি?'

কী অর্থ এই পাল্টা জিজ্ঞাসার? বলতে গেলে, একরকমে চিনেছি তাঁকে নিশ্চয়ই হয়তো সেই চেনাটাই আসল। তারপরে আর বাকি কিছু থাকে না। পথের দেখায় সেটাই অনেকখানি। ঘুরে ফিরে, শেষ পর্যন্ত সেই তো মানুষের সামনে অবাক হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছি। সকল মনুষ্যে তাই নমস্কার বারংবার। আমি তাঁর ডাগর গভীর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

'পরিচয় তো আমার চেহারায় জামা কাপড়েই লেখা আছে।' মহাশয়ের চোখে সেই কৌতুকের ছটা, 'তা ছাড়া শুনলেই তো, ভোর না হতে পঞ্চু মণ্ডলের বাড়িতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গেছলাম। আসলে তুমি নামটা শুনতে চাইছো, তাই তো?'

আমি ঘাড় ঝাঁকালাম।

'নামে কি কিছু আসে যায়? মহাশয়ের বিড়িতে আগুন নেই। তবু কয়েকটা টান দিলেন। ফুকো টান। বললেন, 'এমন অনেক অম্বিকা বাঁড়ুজ্জেকে তুমি বাংলাদেশের হাটে ঘাটে ঘুরতে দেখবে। পৈতে আছে, দু বেলা গায়ত্রী জপা হয় না। শুনেছি পূর্ব পুরুষেরা ডাকাতি করতো। হ্যাঁ, ডুমুরদ এক সময়ে ছিল ডাকাতের গ্রাম। ডাকাতি করেই জমিদার। এখনো গাঁয়ের ভেতর এমন বাড়ি দেখতে পাবে, গঙ্গা থেকে যাদের বাড়ির ভেতর ছিপ নৌকো ঢুকে যেতো সুড়ং-এর মধ্য দিয়ে। বিশে ডাকাতের নাম শুনেছো?'

বললাম, 'শুনেছি। বিশে ডাকাত যে কতোজন, তার হিসেব করা মুশকিল।'

'যথার্থ বলেছো।' মহাশয় ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'তাও আবার সে-ডাকাত যদি হয় বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডুমুরদতেও এক ডাকাত ছিলেন বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।'

এবার আমার চোখে ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসা। অম্বিকা বাঁড়ুজ্জে মশাই মুখ থাবাড়ি হাত তুললেন, 'বুঝেছি। তুমি যে-বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ভাবছো, ইনি তিনি নন। ইনি নিতান্তই ডাকাত ছিলেন। তুমি যাঁর কথা বলছো, তিনি আসলে ডাকাত ছিলেন না। গরীব রায়তদের নেতা ছিলেন। ইংরেজ কোম্পানি তাঁর মাথার বরাদ্দ দিয়েছিল দশ হাজার টাকা। কোম্পানির ফৌজ নিয়ে যে সাহেব তাঁকে ধরেছিল, নামটা তার মনে করতে পারছিনে। ক্যাপটেন ট্যাপটেন হবে। তবে বিশ্বনাথের দলের লোকই হদিশটা দিয়েছিল। সে-শুনে তো আমাদের ঘাট নেই। যে বিশ্বনাথ বাঁড়ুজ্জের ফাঁসি হয়েছিল, তুমি তাঁর কথাই বলছো তো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'বিলেতে জন্মালে তিনি রবিনহুডের সম্মান পেতেন। এ দেশে বিশে ডাকাত। ইংরেজরা আমাদের মানুষ করেছিল ভালো।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের ধূসর খোঁচা গোঁফ-দাড়ির ভাঁজে বিদ্রূপের বক্র রেখা। দাঁতে কামড়ে নিভে যাওয়া বিড়িতে দেশলাইয়ের

কাঠি জ্বালিয়ে ছোঁয়ালেন। তারপরেই চোখে যেন কিঞ্চিত সন্ত্রস্ত দৃষ্টি, ইংরেজের দোষ ধরলে, তোমার আবার মনে লাগে না তো?'

হেসে বললাম, 'সেই মানুষ করার বোঝা নিয়েই তো চলছি।'

'বটে।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় হেসে বাজলেন, 'বোঝাটাই বিস্তর তুক। জলপড়া। মাদুলির থেকেও বেশি শক্তি ধরে। তোমার সঙ্গে আমার পটবে দেখছি। এবার শোন আর একটা মজার কথা বলি। রবিবাবু যে খামারগাছির ওপারে বজরা বেঁধেছিলেন, তার কারণ বোধহয়, ডুমুরদর ডাকাতির নাম ডাক শুনে।' বলেই, অট্টহাস্য করলেন, 'কিন্তু ডাকাতের বদলে এখন ডুমুরদ সাধু সাধকের গাঁ। একে বলে চালের দান ফেরতা। অবিশ্যি আমার মতো মানুষও আছে। না হলাম সাধু সাধক, না আঁট ঘাট বাঁধা গেরস্থ।'

আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'কেবল প্রকৃতির গভীরে জীবলীলা দেখে বেড়াচ্ছেন।'

'যা বলেছো।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় মোটা ভুরু নাচিয়ে, দুষ্টু শিশুর মতো হাসলেন, 'তাইতো সকলের খুব রাগ। বড় ছেলে কলকাতায় চাকরি করে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোটছেলে চুঁচড়োর কলেজে পড়ে। ছেলেরা কেউ কথা বলতে চায় না। গিন্নির কেবল মুখ ঝাম্‌টা। দেবেই তো। সারাটা জীবন খালি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলাম। অল্প বিস্তর যা জমিজমা আছে, তাও দেখাশোনা করতে পারিনে। এমন মানুষ দিয়ে কী কাজ?'

সত্যিই তো সংসারের দাবী নেই? তার ওপরে আবার রবিঠাকুরের শ্রুতি আর ছবি আঁকা নিয়ে ভাবনা। চোখ বুজে প্রকৃতির গান শোনেন। এমন কি সে-গানের তাল মান লয়ও ধরতে পারেন। এর চেয়ে সংসারে আর অযোগ্য লোক কে আছে। বোঝাই যাচ্ছে, গাঁয়ের পাঁচ কথায়ও থাকেন না। অতএব লোকেই বা মানবে কেন।

'তবে হ্যাঁ, ব্রাহ্মণী খাবার পরে মুখ ঝামটা দেন।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় চোখের পাতা নিবিড় করে হাসলেন, 'ওটাও প্রকৃতির জীবলীলা।' বলেই হা হা স্বরে বাজলেন। হাত উলটে হতাশ ভঙ্গি করলেন, 'কাকেই বা মুখ ঝাম্‌টা। এ জন্মটা এভাবেই কেটে যাবে। ক'টা বাজলো বলো তো?'

এটি বোধহয় গা ঝাড়া দেবার সংকেত। স্বাভাবিক। পথ থেকে ধরে নিয়ে এসে, পড়ে পাওয়া ষোল আনা দিয়েছেন। জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন কি না জানি না। তবে এ জন্মটা যে এভাবে কেটে যাচ্ছে, তাতে তাঁর আফশোস নেই। থাকলে, পথ চলতি এ মানুষের সাক্ষাৎ পেতাম না। হাতের ঘড়ি দেখে বললাম, 'সাড়ে দশটা বেজে গেছে। আমি চলি।'

'বসো।' আমার হাত চেপে ধরে, গোবিন্দর দিকে তাকালেন, 'কী হলো, কৈলাশ কখন ফিরবে?'

গোবিন্দ একবার গঙ্গার দিকে দেখলো। বললো, 'ফিরবে। সোমায় পেরায় হয়ে এল। জাল তুলবে, আবার পেতে ফিরবে। আপনার তাড়া কিসের?'

'না, আমার তাড়া কিসের। ভোরবেলা বেরিয়েছি, ঘর এখন গরম হয়ে আছে।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় মুখ টিপে হাসলেন, 'হাতে করে কিছু নিয়ে ঢুকতে পারলে গরম ঘর ঠাণ্ডা হবে।'

কথার খেই ধরতে পারি না। গোবিন্দর দিকে তাকাই। গোবিন্দ জাল বুনতে বুনতে আমার দিকে চেয়ে হাসলো। বাঁড়ুজ্জে মহাশয় আমার হাতে ঝাঁকুনি দিলেন। চোখে কৌতুক, স্বর নিচু, 'জীবলীলায় কিছু ছল চাতুরি আছে, জানো, নিশ্চয়?'

ছল চাতুরি? ওঁর কাছে তো সেটা প্রত্যাশিত না। আমার অবাক জিজ্ঞাসা চোখের দিকে তাকিয়ে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করেই বললেন, 'ঐ জাল ঝাড়া দেওয়া কিছু যদি পাওয়া যায়, তাই নিয়ে বাড়ি ফিরবো। সেই কোন্ ভোরে বেরিয়েছি তো। একটু আঁশটে গন্ধ নিয়ে ঢুকতে পারলে, একেবারে বশীকরণ।'

প্রথমে কিঞ্চিৎ ধন্দ। কথা ধরতে জানা চাই। জাল ঝাড়া আর আঁশটে গন্ধ হলো মাছ। কৈলাস নদী থেকে জাল তুলে ফিরলে, কিছু আশা আছে। আর সেই মাছ দিয়েই ব্রাহ্মণীকে গুণ করবেন। বিবাদের সন্ধি না। মনোহরণের তুক। একে বলে জীবলীলার ছল চাতুরি। এ ছল চাতুরী রসিকের রসের ভিয়েন। শিল্পীর শিল্প। হাসি সামলাতে পারলাম না।

'খুব মজা পেলে, না?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় চোখ কুঁচকে বললেন, 'তুমি তো ঐ গুণ বশীকরণের শিরোমণি। মজা পাবেই।'

সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিলাম। আমি গুণ বশীকরণের শিরোমণি? মুখ খুলতে যাবার আগেই, সেই মুখ থাবাড়ির হাত তোলা। 'আহা, আমাকে আবার তুক করা কেন? তোমার কি আমার ভাগ্য জানিনে, দু'জনের সাক্ষাৎটা হয়ে গেল। কিন্তু তোমাকে একটু আধটু চিনি তো। ভুল কিছু বলিনি। মিছিমিছি আমাকে ঘাঁটিও না।'

না, ওঁকে ঘাঁটাবার সাহস আমার নেই। সিগারেটটা ধরিয়ে বললাম, 'তবে এই দেখা সাক্ষাতের ভাগ্যটা আমারই। এই ভাগ্যের রহস্যটা যে কোথায় তা আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না।'

'বেশি বোঝার কী দরকার?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় মাথা নাড়লেন, 'রহস্য যেখানে যা খুশি থাক, আমি খুশি তোমাকে পেয়ে। এবার কাজের কথায় আসা যাক। গ্রামটা কি ঘুরে যাবে?'

বললাম, 'ইচ্ছেটা তাই।'

'তারপরে কি ফেরা?'

'না, উত্তরে যাবো।'

'জায়গা ঠিক করা আছে?'

'তেমন কিছু ঠিক করা নেই। পায়ে হেঁটে কি গুপ্তিপাড়া যাওয়া যাবে?'

বাঁড়ুজ্জে মহাশয় ভ্রূকুটি চোখে তাকালেন গোবিন্দর দিকে। তারপরে আমার দিকে, তা যাওয়া যাবে। কিন্তু কেন? কোনো গাঁয়ে যাবে? কারোর সঙ্গে দেখা করার আছে?'

বললাম, 'না, সেরকম কিছু নেই। এমনি ঘুরতে ঘুরতে— ।'

'হুঁ, হেঁটোর জোর কেমন?'

'আজ্ঞে?'

'বলছি পায়ের নড়ায় শক্তি কতো?'

সহসা জবাব দিতে পারলাম না। বাঁড়ুজ্জে মহাশয় ভ্রূকুটি বিস্ময়ে আমার আপাদমস্তক দেখলেন। তারপরে গোবিন্দর দিকে তাকালেন, 'বিস্তর শহরে মাথা খারাপ লোক দেখেছি, এমনটা দেখিনি বাবা। বলে কি না, গুপ্তিপাড়ায় হেঁটে যাবে?'

গোবিন্দ হেঁ হেঁ করে হেসে বাঁচে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, কেউ যায় না?'

'যাবে না কেন? যাদের দায়, তারা যায়। তাদের যাওয়া আর তোমার যাওয়া।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের মুখে অমোঘ বিরক্তি, 'কথা শুনলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।'

গোবিন্দ বললো, 'তাই বা কে যায় দাদাঠাকুর। পথ তো একটুখানি নয়।'

'তুমি আমাকে বলবে?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় তেমনি বিরক্ত চোখে আমার দিকে তাকালেন, 'রেলে চেপে গেলে, সোজা পথে কম করে বারো চোদ্দ মাইল। গুপ্তিপাড়া হলো, হুগলি জেলার শেষ সীমানা। পায়ে হাঁটা পথ অনেক ঘোরা। তার মধ্যে আছে বেউলে নদী, সুখড়িয়ার গঙ্গেটিয়া খাল। হেঁটে গেলেই হলো? বাপ মা মরা দায় তো নেই?'

তা নেই। পিতৃহীন বটে। সে-দায় কাটিয়ে এসেছি। মা এখনও সজ্ঞানে জীবিত। গত মাসে শ্যামা ক্ষ্যাপার সঙ্গে নৌকোয় ভেসে গিয়েছিলাম। এবারে ইচ্ছা ছিল স্থলে যাওয়া। যাকে বলে, দানা খুঁটতে খুঁটতে যাওয়া। সেই কথাটাই বললাম, 'ত্রিবেণী থেকে নৌকোয় করে গুপ্তিপাড়া ছাড়িয়ে গেছি। এবার ভেবেছিলাম, ডাঙা পথে ঘুরতে ঘুরতে যাবো। এই যেমন এখানে ঘুরে গেলাম।'

'তা হলে আজ রাত্রের মধ্যে আর গুপ্তিপাড়া পৌঁছুতে হবে না। বড় জোর, শ্রীপুর পর্যন্ত দৌড় হতে পারে। এই চোত মাসের রোদ আর ধুলো। খাবে থাকবে কোথায়?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় ঘাড় বাঁকিয়ে ভ্রূকুটি চোখে বিঁধলেন আমাকে।

গোবিন্দ চিন্তিত মুখে বললো, 'শ্রীপুর না হলেও হাট গোবিন্দগঞ্জ ওরা যেতে পারেন।'

'আরে ধ্যেত্‌তোর হাট গোবিন্দগঞ্জ। থাকবে কোথায়?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় ধমক দিয়ে উঠলেন।

গোবিন্দ বললো, 'বলাগড় ইস্টিশনে রাতটা কাটাতে পারেন।'

বাঁড়ুজ্জে মহাশয় আমার দিকে তাকালেন। চোখের ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসাটা পড়তে অসুবিধা নেই। কুণ্ঠিত হেসে বললাম, 'তা একটা রাত্রি ইস্টিশনে থেকে যেতে পারবো।'

'যা খুশি তাই করো গে।' তিনি আবার একটি বিড়ি বের করে, দাঁতে কামড়ে ধরলেন। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে, বিড়ি ধরিয়ে, ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন।

গোবিন্দ আমাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে যেন ধন্দে পড়ে গিয়েছে। মুখ ফিরিয়ে তাকালো উঠোনের ওধারের ঘরের দাওয়ায়। দুই বধূ আর কিশোরীও এই দিকে তাকিয়ে। এক বধূর ঘোমটা খসা। তিন জনের চোখে ধন্দ। পাশাপাশি তিন মূর্তি, সেও এক চিত্র। সংকটে পড়েছি আমি। কিন্তু সংকটই বা কিসের? এবার উঠে বেরিয়ে পড়লেই তো হয়।

'তোমার মতলবটা কি বলো তো?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় এবার একটু শান্ত, 'ঘুরে বেড়িয়ে দেখে ফেরা, তাই তো?'

আমি হেসে মাথা ঝাঁকালাম। মহাশয় গম্ভীর স্বরে বললেন, 'হেসো না। আমার হাসি দেখলে ব্রাহ্মণীর গা জ্বালা করে। এখন তোমাকে দেখে আমার তাই করছে।'

গোবিন্দ একলা হেসে উঠলো না। উঠোনের ওপারের দাওয়ায়, হাসির ঝনাৎকার বাজলো। কিন্তু বাঁড়ুজ্জে মহাশয় এখন আর জীবলীলা দেখছেন না। রুষ্ট চোখে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, 'তোমরা তো হেসে খালাস। এ ক্ষ্যাপা ছোকরাকে কী বলবো বলো তো? যেন নারদের ঢেঁকি চেপে বেরিয়েছে, যেখানে যেমন খুশি চলে যাবে। মামদোবাজী নাকি?'

উঠোনে দাওয়ায় আবার হাসি। হাসি বোধহয় সজনের ডালে। ডালেও কু-উ-উ কুউ-উ তো কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে। নিকানো দাওয়ায় ঝরা পাতার ভিড় বেড়েছে। উঠোনের একপাশে ছড়ানো ধানের দিকে কয়েকবারই পায়রা উড়ে এসে বসতে গিয়ে, পাখা ঝাপটে পলাতক। লোভের নজরে প্রথমে মানুষ চোখে পড়ে না। কিন্তু মহাশয় দেখছি সত্যি বিচলিত। অন্যথায় 'মামদোবাজী' উগ্রোতেন না। অস্বস্তি আমারও।

'দেখ বাপু, তুমি যদি ভেবে থাকো, সবই বৃন্দাবন, আর সবখানেই কালাচাঁদ, তাহলে ভুল করবে।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় গম্ভীর মুখে বললেন, 'গোবিন্দ বলল, আর তুমিও অমনি বলে দিলে, ইস্টিশনে থাকবে। ওরকম বলা যায়, থাকা যায় না। বুঝি, তোমার মতলব হলো, আহার যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে। তা চিড়ে মুড়ি মুড়কি জুটবে, কিন্তু হট্টমন্দির বলতে যা বোঝাচ্ছে, তা পাবে না। আমার কথা শুনবে?'

বললাম, 'বলুন।'

'আশেপাশের গাঁয়ে ঘুরে যদি দেখতে চাও, দেখে এস। তার আগে উত্তমাশ্রমে একবার কথা বলে যাও।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় রীতিমতো ভেবে চিন্তে যুক্তি দিয়ে সলাপরামর্শ দিলেন, 'হয় তো হৃষিদা—থুড়ি, বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীজী রাত্রে আশ্রমে খেতে থাকতে দিতে পারেন। হৃষিকেশ মুখুজ্জে ছিল ওঁর গৃহাশ্রমের নাম। এখন বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী, আশ্রমের অধ্যক্ষ। গ্রাম সুবাদে এক সময়ে আমাদের হৃষিদা ছিলেন। সে যাই হোক, একটু কড়া মেজাজের লোক। তা তোমার সে গুণে ঘাট নেই, ওঁর পায়ে ঠাঁই নিতে পারবে। তা হলে গোবিন্দর সঙ্গেই বেরিয়ে পড়তে

পারো। ও তো খামারগাছির হাটে যাচ্ছে। ওখান থেকে বাঘনা সিজে ঘুরে আসতে পারো। কিন্তু দেখবার কিছু নেই।'

গোবিন্দ বলে উঠলো, 'বাঘনা সিজে দু জায়গাতেই জগন্নাথ ঠাকুর আছেন।'

'তা কী হয়েছে?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় বিরক্ত মুখে তাকালেন, 'চৈত্রমাসে রথযাত্রা দেখাবে তুমি?'

গোবিন্দ ঠেক খেয়ে, মাথা নেড়ে হাসলো, 'তা কি করে দেখাব।'

'তা হলে বলছিলাম কি— ।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় উঠোনের ওপারের দাওয়ায় মুখ ফেরালেন, 'বুঝলে গোবিন্দর বউ, গোবিন্দর সঙ্গে একেও দুটি ভাত খাইয়ে দাও।'

আমি চমকে উঠে বললাম, 'কাকে? আমাকে?'

'কেন এদের বাড়িতে খেলে জাত যাবে?' মহাশয়ের চোখ ঘাড়, দুইই বাঁকা।

হেসে বললাম, 'যা নেই, তা নিয়ে মাথা ব্যথাও নেই। এখন আমি ভাত খেতে পারব না।'

'তবে দুপুরবেলা, কে কোথায় তোমার জন্য পঞ্চ ব্যঞ্জন রেঁধে ভাত নিয়ে বসে থাকবে?'

হেসে বললাম, 'সেই আশা নিয়ে বেরোইনি। তবে ঐ যে শ্রীপুর আর সুখড়িয়ার কথা বলেছিলেন, ঐ গ্রাম দুটো দেখার ইচ্ছে আছে। শুনেছি, মুস্তোফিদের অনেক কীর্তি আছে সেখানে।'

'কোথায় শুনেছো?'

একটু ঠেক খেয়ে গেলাম, 'শুনেছি, মানে পড়েছি।'

'কিন্তু এটা জানো না, সে সব এখন কিছুই নেই। জঙ্গলের মধ্যে সব ভাঙাচোরা। তবে কিছু নেই বলবো না। এখনো অনেক কিছুই আছে। বাঁড়ুজ্জে মহাশয় ভ্রূকুটি অবাক চোখে তাকালেন, 'সব তো ঠিক করেই বেরিয়েছো। তবে, পায়ে হেঁটে যাবার পাগলামিটা মাথায় চাপলো কেন?'

'ভেবেছিলাম—।'

'বুঝেছি।' সেই মুখ থাবাড়ি দেওয়া হাত তুললেন, 'ভেবেছিলে হেঁটেই মেরে দেব। রাস্তাঘাট কেমন কতো দূর, সে-সব মাথায় নেই। পাড়াগাঁয়ে ঘোরা এত সহজ নয়। এখন যা বলছি শোনা। তা হলে আর গোবিন্দর সঙ্গে যাবার দরকার নেই। মুস্তোফিদের কথা যখন জানো, তখন তাঁদের কীর্তিই দেখ। একদিনে, একবেলায়, কিছুই দেখা হবে না। দুপুরের ট্রেনে চেপে বলাগড়ে গিয়ে নামবে। সেখান থেকে শ্রীপুর সুখড়িয়া, আরো অনেক গ্রাম পাবে। কিন্তু ইস্টিশনে নেমে, ডমুরদর মতো এত কাছে নয়। হাঁটতে হবে। ওখানে গঙ্গা আরো দূরে। যদি মনে কর, একবেলাতেই সব সেরে, শেষ গাড়ি ধরে গুপ্তিপাড়া যাবে, তাও যেতে পারো। কিন্তু—।' নিভে যাওয়া বিড়িতে আবার দেশলাইয়ের কাঠি ঘষে ছোঁয়ালেন, 'পারবে না। রাতও হয়ে যাবে। গাঁয়ের যতো বড় মানুষই হোক, আনকা অচেনা লোককে কেউ থাকতে দেবে

না। আর তেমন পাল্লায় পড়লে, হাতের ঘড়ি, কাঁধের ঝোলা, সবই যাবে। জীবলীলার অনেক খেলা।' চোখের পাতা কুঁচকো হাসলেন। ওদিকে বিড়ির আগুনে ছাই।

এত সাত-পাঁচ ভেবে পথে বেরোই না। ভাবলে, বেরোনো চলে না। তবে, বাঁড়ুজ্জে মহাশয় জীবলীলার একটা দিক দেখেন না। অনেক দিকে লক্ষ। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মনুষ্য প্রকৃতিও দেখতে ভোলেন না। কথায় বলে, উপদেশ নিতে হলে তিন মাথার কাছে যাবে। এ তিন মাথা, তে-মাথার মোড় না। হাঁটু-মাথা একাকার হয়েছে, এমন বৃদ্ধের আর এক নাম তিন মাথা। বয়সের ভাঁড়ারে জমা থাকে অনেক অভিজ্ঞতা। বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের এখনও দু' হাঁটুতে মাথা ঝুলে পড়েনি। কিন্তু এখন দেখছি, তিনি আমার তিন মাথা। অতএব তাঁর উপদেশ শিরোধার্য। কাঁধের ঝোলা গুছিয়ে নিয়ে বললাম, 'তবে তাই যাই।'

'কোথায় যাবে?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় হাত টেনে ধরলেন, 'রেলগাড়ি কি তোমার ইচ্ছেয় আসবে? এ কি তোমার ব্যান্ডেল হাওড়া লাইন পেয়েছো, ঘণ্টায় ঘণ্টায় গাড়ি? সেই দুপুর একটার পরে গাড়ি। কী রকম ছেলে বলো দিকিনি?' মুখ ফেরালেন গোবিন্দর দিকে।

গোবিন্দর বললো, 'বাবু একটু ব্যস্ত হয়েছেন।'

'জলে পড়ে নেই তো।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় ভ্রূকুটি করলেন, 'ব্যস্ত হবার কী আছে?'

বললাম, 'এ গ্রামটা একটু ঘুরে দেখে যাই।'

'এ গ্রাম ঘুরতে তোমার বেশি সময় লাগবে না। ইস্টিশনে যাবার আগে, একবার দক্ষিণ দিকে ঘুরে এস, তা হলেই হবে।' তিনি গোবিন্দর দিকে তাকালেন, 'তার আগে একে একবার আশ্রমে নিয়ে যাও। বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীজী এতক্ষণে বোধহয় মন্দির থেকে বেরিয়েছেন।'

গোবিন্দ বললো, 'আপনি নিয়ে যান না কেন?'

'আমি!' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় যেন বিভীষিকা দেখলেন, 'আমি যাবো। আশ্রমে, স্বামীজীর সামনে?'

গোবিন্দ হেসেই বাঁচে না। উঠোনের ওপারের দাওয়ায়ও সেই হাসির ঢেউ লাগলো। ব্যাপার বুঝলাম না। দেখলাম, বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের ভ্রূকুটি সন্দিগ্ধ চোখের দৃষ্টি উঠোন থেকে ওপারের দাওয়ায় হানছে। তারপরে আমার দিকে দেখলেন অনুসন্ধিৎসু চোখে। আবার গোবিন্দর দিকে, 'হুঁম, আমার পেছনে লাগছো?'

গোবিন্দর হাসি তবু থামে না। 'তা একবার গেলে কী আর হবে? না হয় একটু বকা ধমক করবেন।'

'বকা ধমক?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের চোখে আবার বিভীষিকা, 'খড়ম পেটা করে তাড়াবেন।'

উঠোনে আর ওপারের দাওয়ায় হেঁ হেঁ খিলখিল বাজনা বেজে উঠলো। আমার

চোখে যে-ধন্দ, সেই ধন্দ। তবু, পেছনে লাগার ব্যাপারটা পরিষ্কার। আর সেই কারণে গৃহস্থদের হাসিটা আমার মধ্যে সংক্রামিত হচ্ছে। খড়ম পেটা খাওয়াটা বিভীষিকা বই কি! কিন্তু তার কারণ কী?

'বুঝলে?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় আমার দিকে তাকালেন।

আমি গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লাম। মহাশয় আবার দেখলেন গোবিন্দর দিকে, 'আমার পেছনে লাগছে, বুঝতে পারছো না? আমাকে বলে আশ্রমে যেতে! জানে, বিজ্ঞানানন্দজী আমাকে দেখলেই তাড়া করবেন।'

'কেন?' আমি সংকুচিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি নষ্ট হয়ে গেছি না?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'এক সময়ে তো স্বামীজী খুব ভালবাসতেন আমাকে। কিন্তু ঐ যে বললাম, ধর্মেকর্মে আমার মতি নেই। তার ওপরে আবার নেশাভাঙ করি। খবর তো সবই রাখেন। আশ্রমে আমার প্রবেশ নিষেধ। দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। গোবিন্দ ব্যাটা ছুঁচো, সব জানে তো। তাই তোমাকে নিয়ে আমাকে যেতে বলছে।'

গোবিন্দও জীবলীলা দেখছে, আর হাসছে। ওপারের দাওয়ায়ও ভিন্ সুরে হাসি বাজছে। বড় ছোঁয়াচে জিনিস। কিন্তু আমাকে রামগড়ুরের ছানা হয়েই থাকতে হয়। তা নইলে ছুঁচো ব্যাটা। গোবিন্দর দিকে তাকাতেই ভয় পাচ্ছি। তবে তার রসজ্ঞানের গোড়ে সালাম। বিটলে আছে।

'খুব হয়েছে, এখন হাসি থামাবে?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় ধমকে বাজলেন।

গোবিন্দ জালের সুতোকাটি সহ হাতজোড় করলো, 'রাগ করলেন নাকি দাদাঠাকুর?'

'না বড় আনন্দ হচ্ছে। তুমি আমাকে স্বামীজীর কাছে পাঠাচ্ছিলে।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের মুখে রুষ্ট বিরক্তি কত, 'এখন কাজের কথা যা বলছি, তাই শোন। তোমার হাটে যাবার সময় হল। তুমি একে আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে এস, তা হলেই হবে। তারপর এ স্বামীজীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই হবে।'

কী হবে, তা বুঝতে পারছি না। আশ্রমে যেতেও আপত্তি নেই। কিন্তু স্বামীজীর কাছে গিয়ে দাঁড়াবো কেন? আমার শ্রদ্ধা ভক্তির অভাব নেই। কিন্তু ব্রহ্মচর্য আশ্রমের মানুষ নই। আশ্রমিক নিয়ম নীতিকে দূর থেকেই সমীহ করি। ওখানে আমার কৃত কিছু নেই। আমি সাধন ভজনে নেই।

গোবিন্দ আমাকে ডাকলো, 'চলেন তা'লে।'

'দাঁড়াও, কথা শেষ হয়নি।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় আমার দিকে তাকালেন, 'এ বেলা আশ্রমেই দুটি অন্ন জুটে যাবে, বুঝলে? স্বামীজীকে গিয়ে প্রণাম করে বস।'

আমি হাতজোড় করলাম, 'তা বসবো, তবে অন্নের জন্য নয়।'

'আচ্ছা, তুমি গিয়ে বস তো। তারপরে দেখা যাবে।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় হাত নাড়া দিলেন, 'কিন্তু আসল কথাটার নিষ্পত্তি হয়নি। আজ যদি শ্রীপুর থেকে ফিরতে না পারো তা হলে?'

বললাম, 'তখন ভেবে দেখবো।'

'ভেবে দেখবে কাঁচকলা।' মহাশয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালেন, 'শোন, শ্রীপুরে একটা বৈষ্ণবদের আখড়া আছে। গোলকদাসের আখড়া। বেশিদিনের পুরনো নয়। শ্রীপুরের আসল নামটা জানা আছে কী?

বললাম, 'আঁটিশেওড়া।'

'হুম্!' মহাশয় নিবিড় চোখে তাকালেন আমার দিকে, 'কেতাব ঘাঁটা আছে দেখছি। আঁটিশেওড়ার পাট বলে একটা জায়গা আছে, সেটা জানা আছে?'

বললাম, 'আছে। চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে যাবার পথে, আঁটিশেওড়ার এক বটগাছের নিচে বসে বিশ্রাম করেছিলেন। সেখানেই আঁটিশেওড়ার পাট। আঁটিশেওড়ার পাটের আরও একটা কথা পড়েছি।'

'আঁতুড়ের ধোঁয়া?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় হাসলেন।

তার মানে, আমার কেতাবী খবরের থেকে, তিনি কিছু কম জানেন না। প্রবাদ এই রকম, আঁটিশেওড়ার ঘাটের কাছে, গৃহস্থরা কোনরকম সূতিকাগার করতে পারবে না তার ধোঁয়ায় পুণ্যস্থান নাকি অপবিত্র হবে। অথচ শুনে আসছি, আঁতুড়ে নিয়ম নাস্তি। লৌকিক আচারে ওটা বোধহয় জরুরি ব্যবস্থা। মানুষের জন্মস্থানের ধোঁয়াও অপবিত্র হয়? বললাম, 'হ্যাঁ।'

'হুঁম্, কেতাবের বজ্র আঁটুনি, আসলে, ফস্‌কা গেরো।' মহাশয় হেসে মাথা ঝাঁকালেন, 'এবার শোন, আজ আর ফেরবার চেষ্টা করো না। গোলকদাস বাবাজীর আখড়ায় চলে যেও। আখড়াটা গঙ্গার ধারের কাছে। বাবাজী মানুষ ভালো। চালার মন্দিরে গৌর নিতাইয়ের মূর্তি আছে। শিষ্য আছে অনেক, আখড়া চলে ভাল। বাবাজী সহজিয়া বৈষ্ণব। প্রকৃতি আছে। তবে নেহাত নেড়া নেড়ির আখড়া নয়। বুঝলে কিছু?'

বললাম, 'শুনেছি সহজ সাধন নয়। বাউলের তত্ত্ব। তবে বাউলের তো বিগ্রহ নেই বলে জানি।'

'সহজিয়া বৈষ্ণবের থাকে। রাধাকৃষ্ণ গৌর নিতাই। তবে বাউলের সঙ্গে বিশেষ তফাৎ নেই। এঁরাও যোগে বিশ্বাসী। মহাশয় হাত নাড়া দিলেন, 'সে তুমি ওখানে গেলেই সব দেখতে পাবে। একেবারে সোজা গোলকদাসের কাছে গিয়ে মাথা ঠুকো, তা হলেই হবে।'

এতক্ষণে একটা কথা বুঝেছি। অম্বিকা বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের কথার প্রতিবাদ নিরর্থক। গোলকদাস বাবাজীর আখড়ার যাই না যাই, এখন ঘাড় কাত করাই ভাল। তিনি তো মন্দ চাননি। এবারের যাত্রায় তাঁর সঙ্গে প্রথমে দেখা। আমাকে ডেকে জীবলীলা দেখিয়েছেন। কেবল কি তাই? লৌকিক, অলৌকিক কোনো ধর্মে নেই। জীবলীলার নামে বসে আছেন মানব ধর্মের গোড়ায়। আধুনিক মানুষের সংজ্ঞা নিয়ে বিস্তর বাগবিতণ্ডা। আমার চোখে এই সামান্য গ্রামীণ ব্যক্তিটি এক অসামান্য আধুনিক। এমন

মানুষকে সহজে ছাড়তে ইচ্ছা করে না। কৃতজ্ঞতাও বোধ করি। কিন্তু সময় বহে যায়। আমার ডান হাতটা সহজেই চলে যায় তাঁর ধুলা মাখা পায়ের দিকে, 'তা হলে উঠি।'

'কিন্তু এটা আবার কি?' মহাশয় আমার হাত চেপে ধরলেন।

বললাম, 'আন্তরিকতা।'

বাঁড়ুজ্জে মহাশয় এক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হাতটা ছেড়ে দিলেন। আমি ওঁর পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ছোঁয়ালাম। মহাশয়ের ডাগর চোখে বিষণ্ণতা। বললেন, 'খুব ইচ্ছে করছে, তোমার সঙ্গে চলে যাই।'

বললাম, 'চলুন না।'

তিনি কোনো জবাব দিলেন না। আমি দাওয়া থেকে নেমে এলাম। মহাশয়ও নেমে এলেন, 'তোমার মনে থাকবে কি না জানিনে, আমার থাকবে।'

বললাম, 'আমারও থাকবে।'

'সত্যি?' মহাশয় আমার বুকে একটা হাত রাখলেন। আবার তাঁর চোখে সেই কৌতুকের ছটা। মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হুম্! তুমি ডাক দেবেই, কারণ তোমাকে ডাকছে আর কেউ। আমি এখন ডানা ভেঙে বসে আছি। তোমার মত বুকে আগুন থাকলেও, ছুটতে পারছি না। তাই পঞ্চু মণ্ডলের বাড়ি যাই, গাঁয়ে ঘুরে বেড়াই। আর ব্রাহ্মণী যাকে বলে বইয়ের পিণ্ডি, তাই চটকাই। যাই হোক, তোমায় আর দেরি করাবো না। তবে রঙের হাতটা ছেড়ো না, ওটা চালু রেখো।'

আমি গোবিন্দর দিকে তাকালাম। গোবিন্দ পুব দিকে পা বাড়িয়ে ডাকল, 'আসেন।'

একবার উঠোনের ওপারের দাওয়ার দিকে তাকালাম। সহবতের সঙ্গে হৃদয়ের একটা যোগ আছে। ঘোমটা খসে পড়াটা এখন অসহবত নয়। সেই পাড় ঢেঁকি দেওয়া দুই রমণীর ছবি ভেসে উঠলো চোখের সামনে। ওধারের দাওয়ায়ও দেখছি, আর একটা ছবি। একজনের ঘোমটা টানা অবকাশেই শোনা গেল, 'চাড়ডি ভাত খেয়ে গেলে হত।'

গোবিন্দ থম্‌কে দাঁড়ালো। দৃষ্টি মহাশয়ের দিকে। ল্যাংটা ছেলেটা আবার উঠে এসেছে গঙ্গার ঢালু পাড় থেকে। সঙ্গে সেই সারমেয়। এখনও তার গলায় গোঁ গোঁ। ঘেউ ঘেউ নেই। মহাশয় বললেন, 'গোবিন্দর বউ, ওর যাত্রা অন্যদিকে। তোমার ঘরের অন্ন কপালে থাকলে আবার আসবে।'

আমি ওপারের দাওয়া থেকে চোখ ফিরিয়ে মহাশয়ের দিকে তাকালাম। তিনি হাত তুলে হেসে, দাওয়ার চালার আড়ালে চলে গেলেন। যেন উঠোনের কাছেই বিদায় নিয়ে বললাম, 'যাই।'

'যাই না, আসি।' কথাটা এলো রমণী স্বরে, ওপারের দাওয়া থেকে। ঢালুতে নেমে যাবার আগে, পিছন ফিরে তাকালাম, 'তবে আসি।'

গঙ্গার পাড় বেশ উঁচু। স্রোতের টান দেখলে বোঝা যায়, জোয়ার এসেছে। গত

মাসে ত্রিবেণী থেকে, শ্যামা ক্ষ্যাপার নৌকোয় ভেসে গিয়েছিলাম। নৌকো ছিল প্রায় মাঝ দরিয়ায়। তখনই শ্যামা ক্ষ্যাপার মুখে উত্তমাশ্রম আর রামাশ্রমের কথা শুনেছিলাম, এখন সেই গাঁয়ের ডাঙ্গায়। চৈত্রের রোদে নদীতে ইস্পাতের ঝিলিক। দূরে ইতস্তত কয়েকটা নৌকো।

গোবিন্দ গঙ্গার বুকে দেখতে দেখতে, দক্ষিণে চলেছে। কিছুটা গিয়ে, ডান দিকে ঢালু থেকে ওপরে উঠলো। আমি ওর পিছনে। বাঁ দিকে একটা বড় বট গাছ। কাছে একটা চালা ঘর। বট গাছের নিচে বসে আছে একটি অল্প বয়সের বউ। জীর্ণ শাড়িটি গায়ে অকুলান। দৃষ্টি ছিল দূর দরিয়ায়। আমাদের দেখে, শাড়িটি টানাটানি শুরু করলো। কিন্তু সে তো টানলে বাড়ে না। কেবল লজ্জাই বাড়ে।

বাতাসে এখন উত্তাপ। পাতা ঝরার কামাই নেই। অথচ গাছে গাছে শ্যাম কচিতে চিকন কিরণ। কুহু কেবল কানে কি মধু ঢালে? ওরা বসন্তের দূত কী না জানি না। মাঝে মাঝে মনে হয়, ঐ ডাকে একটা বুক ফাটা আর্তি আছে।

গোবিন্দ দাঁড়ালো। দেখলাম, ডান দিকে ছোট পাচিল। কোমর সমান হবে। ভিতরে বাগান আর উঠোন। পশ্চিমে মন্দির। মন্দিরের চারপাশে লাল মেঝের রোয়াক। উত্তরে একতলা ঘর। পুবেও একটি মন্দিরের তুল্য আবাস। দেখলাম, কয়েকজন গেরুয়াধারী এদিকে ওদিকে বসে আছেন, বা কাজে ফিরছেন। গোবিন্দ বললো, 'মহারাজ এখনো মন্দির থেকে বেরন নাই। আপনি ভেতরে যান।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি যাবেন না?'

'আমি আর যাব না।' গোবিন্দ নিরীহ সংকোচে হাত জোড় করলো, 'আপনি গিয়ে স্বামীজীদের সঙ্গে কথা বলেন, তা হলেই হবে।'

গোবিন্দর অনিচ্ছা নেই। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, কোথায় একটা বাধা তাকে টেনে রাখছে। বললাম, 'তাই যাচ্ছি।'

'আমি তা'লে আসি।' গোবিন্দ জালের সূতো কাটি শুদ্ধু দু হাত কপালে ঠেকালো। আমিও দু হাত কপালে ঠেকালাম। গোবিন্দ যে-পথে এসেছিল, সেই পথেই নেমে গেল। আমি পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আশ্রমে ঢোকবার সেই গেট। এগিয়ে গিয়ে, ডান দিকে পাচিলের শেষে মন্দির প্রাঙ্গণে ঢোকবার পথ। স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে ঢুকবো কিনা বুঝতে পারছি না। ইঁট বাঁধানো সরু পথ করা রয়েছে। মন্দিরের সামনে ছাদ ঢাকা লাল ঝকঝকে রোয়াকের ওপর একজন স্বামীজী বসে আছেন। কয়েক পা গিয়ে স্যান্ডেল খুলে রেখে, তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। দু হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলাম। স্বামীজী বললেন, 'জয়স্তু।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীজীর দর্শন পাবো?'

'তিনি তো এখন ধ্যানে আছেন।' স্বামীজী মন্দিরের বন্ধ দরজা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

বললাম। তিনি বললেন, 'বসুন। তিনি বেরোলে দেখা হবে।'

বললাম, 'আমি তা হলে একটু ঘুরে আসি।'

'আসুন।' স্বামীজী নিরাসক্ত স্বরে বললেন।

আমি ফিরে এসে, স্যান্ডেল পায়ে গলিয়ে, প্রাঙ্গণের বাইরে এলাম। ডান দিকে আম বাগান। চারদিকে গাছপালায় নিবিড়। আশ্রমের শান্ত গাম্ভীর্যের থেকেও চৈত্র প্রকৃতির উচ্ছ্বাসটাই যেন মাতিয়ে দিচ্ছে। আম গাছে অজস্র কচি আম। কাঁঠাল গাছে কচি এঁচোড়গুলো লোমশ ধাড়ি ইঁদুরের মতো ঝুলছে। গায়ে মাথায় ছড়িয়ে পড়ছে শুকনো পাতা কাটির টুকরো।

পায়ে পায়ে আশ্রমের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ডান দিকে আর একটু এগিয়ে বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আশেপাশে আঁস, শ্যাওড়া, ঝাঁটি, বাবলার ঝাড়। চড়ুইয়ের ঝাঁক উড়ছে। পশ্চিমে মাঠের ওপারে ইস্টিশনটা দ্বীপের মতো। দেখছি কিছু সাঁওতাল রমণী পুরুষ, মাঠের মানুষ মাথায় বোঝা নিয়ে চলে যাচ্ছে। উত্তরে। খামারগাছির হাটে যাচ্ছে বোধহয়।

পরে জেনেছি, গ্রাম কালনার গৃহী, নীলকান্ত রায় পরবর্তীকালে সাধক উত্তমানন্দ। উনিশশো ন' খ্রিস্টাব্দে তিনি এ স্থানটি আশ্রমের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। তখন ছিল ঘোর জঙ্গল। এক বিঘা চার কাঠা কেনা হয়েছিল, তাঁর শিষ্য ধ্রুবানন্দ গিরি-মহারাজের নামে। প্রথমে দুটি মাটির চালা ঘর, এখন পাকা মন্দির কোঠা ঘর শ্রীবৈভবে পূর্ণ।

দক্ষিণে হাঁটা দিয়ে গ্রাম ঘুরতে ঘুরতে, আবার গঙ্গার ধারে। একবার ঘণ্টা শুনে মনে হয়েছিল ভিতরে কোথাও ইস্কুল আছে। আশ্রমে ফিরে যাবার আর ইচ্ছা ছিল না। মহাপ্রাণীর হাহাকারটা ছিল। বেলা বারোটা তখন উত্তীর্ণ। গাঁয়ের পথের ধারে, একটা দোকান চোখে পড়লো। চিঁড়ে মুড়কি পাওয়া গেল। ঠোঙা হাতে সোজা ইস্টিশন। লাইন পেরিয়ে পাকা রাস্তার ধারে একটা চালাঘর। সেটাও দোকান। মুড়ি বিস্কুট চা মেলে। পান বিড়িও আছে। উনোনে আগুন জ্বলছে। বাইরের চৈত্রের বাতাসেও উত্তাপ বাড়ছে।

দোকানের ভিতরে চওড়া কাঠের বেঞ্চির ওপরে যে বসে আছে, সে-ই বোধহয় মালিক। কালো রঙ, খালি গা। হাঁটুর ওপরে ধুতি। আর এক দিকের ছোট বেঞ্চিতে বসে দুই জোয়ান। তাদেরও খালি গা, পরনে লুঙ্গি। রাস্তার ওপারে পশ্চিমে একটা পুকুর। মেয়ে পুরুষরা স্নান করছে। হাঁসের দল ভাসছে মাঝ পুকুরে। পুকুরের ওপারে কিছু খড়ের চাল, মাটির ঘর। গোটা কয়েক ছাগল বাঁধা পুকুরের ধারে বটের ছায়ায়।

দোকানের মাঝবয়সী মালিক তাকিয়েছিল জিজ্ঞাসু চোখে। জিজ্ঞেস করলাম, 'চা পাওয়া যাবে?'

'যাবে।' সংক্ষিপ্ত নিচু স্বরের জবাব।

ভেতরে ঢুকে, দুই জোয়ানের পাশে বসলাম। চায়ের তেমন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন পানীয় জলের। চা হলো প্রবেশাধিকারের টিকেট। ঠোঙা খুলে, চিঁড়ে

মুড়কি ঘেঁটে নিলাম। কিন্তু শহুরে মনে কোথায় একটা দ্বিধা। না বলে পারলাম না, 'আপনার দোকানে বসে একটু চিঁড়ে মুড়কি খেয়ে নিচ্ছি।'

'খান না।' লোকটি হল্‌দে চোখে তাকিয়ে হাসলো। সামনের ওপরের পাটির কয়েকটা দাঁত নেই। বেঞ্চি থেকে নেমে, নিচে থেকে বের করলো ঝকঝকে মাঝা ঘটি। কোণে রাখা কলসী থেকে জল গড়িয়ে, রেখে দিল আমার বেঞ্চির ওপরে।

একে বলে না চাইতে জল। যেন একটা অনিবার্য করণীয়। সাত পাঁচ ভাবনা আমার। লোকটির সে-সব জানবার দরকার নেই। আবার গিয়ে বসলো নিজের জায়গায়। তারপরে অবাক করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'চা কি খাবেন? তা হলে জল গরম করব।'

বিদ্রূপ না তো? হলদে চোখের খয়েরি তারা দুটোর দৃষ্টি সরল। সহজ জিজ্ঞাসা। অথচ ওটাকেই আমি প্রবেশাধিকারের টিকেট বলে জেনেছি। এখন 'না' বললে, নিজেকে কেমন মিথ্যাবাদী মনে হবে। এও সেই ছল চাতুরী। বললাম, 'খাবো।'

'যা গরম।' দোকানিটি যেন একান্ত অনিচ্ছায় কালি মাখা কেতলিটা উনোনের ওপর বসিয়ে দিল।

তবু না বলা যায় না। অথচ, এর থেকে আর বেশি সে তোমাকে কী বলতে পারে। নিজেকে দিয়ে তার বিচার। তাই না চাইতেই জল গড়িয়ে দিয়েছে। তোমার টিকিটের গলায় দড়ি। সে নিজেই জানে, এ গরমে চা অচল। অবিশ্যি আমার নিতান্ত অচল না। কিন্তু দেখা গেল, দোকান খুলে বসলেই, বুকের কপাটে কুলুম আঁটতে হবে, এমন কথা নেই। শহুরের অভিজ্ঞতাটা এখানে তেমন বিকোয় না। আতিথেয়তা করবে বলে সে দোকান খুলে বসেনি নিশ্চয়। তবে রাস্তার ধরে তার ঘরে বসে খেলে, তার মূল্য নিতে শেখেনি এখনও। জল দান তো পুণ্য।

আমি ভেতরে ঢোকার আগে, জোয়ান দুটি কিছু বলাবলি করছিল। এখন একেবারে চুপ। মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছে আমাকে। আমি তখন মুড়কির মিঠে স্বাদে, দাঁতে চিঁড়ে কাটছি। হঠাৎ ইস্টিশন থেকে ভেসে এলো ঠং ঠং ঘণ্টাধ্বনি। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সবাই অবাক চোখে আমার দিকে তাকালো। দোকানি জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাবেন?'

বললাম, 'বলাগড়।'

সে ওপর পাটির শূন্য মাড়ি দেখিয়ে হাসলো। হাত তুলে আশ্বস্ত করলো, 'বসেন। এটা ডাউনের গাড়ি আসছে।'

অর্থাৎ কলকাতাগামী গাড়ির ঘণ্টা। এইবার এক জোয়ান আওয়াজ দিল, 'শালার গাড়ি ঘণ্টা কাবার করে আসছে।'

'এ গাড়িটা তো তাই আসে।' দোকানি বললো, 'একদিনও টাইমে আসতে দেখি নি। কাসেম যাবে বলছিল না?'

জোয়ান বললো, 'চাচা গিয়ে ইস্টিশনে বসে আছে।'

আমি ইতিমধ্যে আশ্বস্ত হয়ে বসলেও, না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, 'আপ্-এর গাড়ি ক'টায় আসবে?'

'সে শালার গাড়িও রোজ লেট করে।' লুঙ্গি পরা খালি গা জোয়ান বললো। গাড়ি সবই তার শ্বশুর নন্দনের। সত্যিকারের ব্যাপার হলে, বিবির কপালে অশেষ দুর্গতি ছিল। কিন্তু গাড়ি লেট করে এলে গেলেও, তার যে বিশেষ কিছু যায় আসে, মনে হচ্ছে না। আমার কথার জবাব না পেয়ে দোকানির দিকে তাকালাম। সে বললো জোয়ানকে, 'না, এটা রোজ তেমন লেট করে না। হাওড়া থেকে টাইম মতন ছাড়ে। ব্যান্ডেলের ফাঁড়া কাটাতে পারলেই আর লেট করে না। সোয়া একটার মধ্যে এসে যাবে।'

কবজি উলটে দেখলাম। ঘড়িতে বারোটা চল্লিশ। কাঁটা বোধ হয় কিঞ্চিৎ জোর কদমে চলছে। পকেটে অবিশ্যি টিকেট আছে। তবু চিঁড়ে মুড়কির মুখ চালালাম তাড়াতাড়ি। দোকানি এতক্ষণে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি আসছেন কোথা থেকে?'

বললাম। শুনে হলদে চোখে অবাক জিজ্ঞাসা ফুটলো। দুই জোয়ানও তাকালো। দোকানি জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে কারুর বাড়ি গেছলেন বুঝি?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না, এমনি বেড়াতে এসেছিলাম।'

বুঝতে পারলাম, দোকানি আর জোয়ান দুজনের মধ্যে অবাক দৃষ্টি বিনিময় হলো। হবারই কথা। তাদের তো রেলগাড়ির সময় ধরে হিসাব। এতক্ষণ ধরে একটা লোক কেবল গ্রাম বেড়িয়ে ফিরলো? নেহাত বেড়ানো? কারণ কী? দৃষ্টি বিনিময়ের কারণ বুঝতে পারছি। ঘরে বসতে দিতে পারে। ঘটিতে জল গড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু এখানেই ঠেক। গ্রামীণ মনটা সহজে নিশ্চিন্তে হতে পারে না। উদাস নির্বিকার থাকতেও পারে না। সন্দেহ খচ্ খচ্ করে। অথচ এ কৌতূহল মেটাবার উপায় নেই। এমনি গ্রাম বেড়িয়ে ফেরা নিতান্ত অবিশ্বাস্য। আমারই বা এত সরল স্বীকারোক্তির দরকার কী ছিল।

'এতক্ষণ ধরে গেরাম বেড়ালেন?' দোকানির দাঁত শূন্য মাড়ির হাসিটি আর তেমন খোলতাই নেই।

ঝোপ বুঝে কোপ। বললাম, 'হ্যাঁ। উত্তমাশ্রমে গেছলাম।'

'তা-ই বলেন।' এবার হলদে চোখে, কালো মুখে হাসির ঝলক। জোয়ানদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি ভাবি, এমনি আবার কেউ গেরাম বেড়াতে আসে নাকি? শীতের দিনে হুগলি চুঁচড়োর লোকেরা আসে চড়ুইভাতি করতে। সে আলাদা কথা।'

আমারও অস্বস্তি কাটলো। ডাউনের গাড়ির কু শোনা গেল। দুই জোয়ান উঠে বাইরে গেল। এদিকে আমার ঠোঙার চিড়ে মুড়কি আর যেন ফুরাতে চায় না। বেজায় ঝক্‌ঝক্ শব্দে গাড়ি এসে দাঁড়াবার শব্দ ভেসে এলো। দোকানের ভিতর থেকে ইস্টিশন দেখা যায় না। কিন্তু তেমন হইচই নেই। এঞ্জিনের সোঁ সোঁ শব্দ

খানিকক্ষণ। তারপরে আবার কু-ঝিক্-ঝিক্। জোয়ান দুটি বোধহয় ইস্টিশনেই গিয়েছে। চার আনার মুড়কি আর আট আনার চিঁড়ে শেষ করা সম্ভব না। জলের ঘটি তুলে উঁচু করে গলায় ঢাললাম। আহ্। শান্তি। এত সহজে পেট ভরে। তারপরেও পেটের চিঁড়ে ফুলবে।

'বলাগড়েও কি বেড়াতে যাচ্ছেন?' দোকানি গেলাসে চা ছাঁকছে।

বললাম, 'না। শ্রীপুর সুখড়িয়া যাবো।'

'শ্রীপুর সুখড়িয়া?' দোকানির হাতের কেতলি থমকে গেল, 'বলাগড়ে লেমে, দু জায়গায় যাবেন কেমন করে? সুখড়িয়া যেতে হলে, আপনাকে সোমড়াবাজারে লামতে হবে। সুখড়িয়া সেখান থেকেই কাছে পড়বে। তবে, শ্রীপুর থেকে হেঁটেই সুখড়িয়া চলে যেতে পারেন। হাঁটতে হবে অনেকটা। তা, সেখানেও কি বেড়াতে যাচ্ছেন?' সে নেমে এসে আমার হাতে ধূমায়িত চায়ের গেলাস তুলে দিল।

বললাম, 'হ্যাঁ। শুনেছি ওখানে অনেক পুরনো মন্দির আছে।'

'তা আছে।' দোকানি তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো, 'তবে কী আর দেখবেন? সবই ভেঙে চুরে গেছে। সেই বলে না, কালে খেয়েছে তাই। মুস্তোফিবাবুরা আর কত রক্ষে করবেন। তাঁদের কি আর সেদিন আছে? আর মন্দির মঠের কি অভাব আছে। জিয়েট বলাগড় সোমড়া গুপ্তিপাড়া, সবখানে বিস্তর রয়েছে। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

চায়ের গেলাসটা মুখের কাছে তুলেছিলাম। বললাম, 'বলুন।'

'আপনি কি গরমেণ্টের লোক?' দোকানির হলদে চোখে কৌতূহল বেশ গাঢ়।

লোকটি কি আমাকে প্রত্ন বিভাগের কর্মী ভেবেছ নাকি? তার পক্ষে এত দূর ভাবা সম্ভব? বললাম, 'না। কেন বলুন তো?'

'আজকাল আপনার মঠ মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি লিয়ে গরমেণ্ট ঘাঁটাঘাঁটি করছে তো।' দোকানি বললো, 'এতকাল ঠাকুরের ভোগ জাত লিয়ে কথা ওঠেনি। এখন ঠাকুরের জমিজমা লিয়ে গরমেণ্ট হিসাব করছে।'

যার যেদিকে মন। মঠ মন্দির দেখতে এসেছি। অতএব সরকারের জমিজমা তদন্তকারী কেউকেটা নিশ্চয়ই হবো। আর গরমেণ্টের লোক কোনোকালেই সন্দেহের উর্ধ্বে না। বিশেষ জমিজমার বিষয়। সরকারি লোক দেখলেই ভয়, খাবলা মেরে তুলে নেবে। অবিশ্যি এই সামান্য দোকানির মনোভাব কী জানি না। চায়ে চুমুক দিয়ে, মুখের ভিতরটা বিস্বাদে ভরে গেল। তার চেয়ে, চিঁড়ে মুড়কির মুখে, মিষ্টি জলের স্বাদ ভালো ছিল। এখন নিরুপায়। জিজ্ঞেস করলাম, 'তা দেবোত্তর জমি কি সরকারে যাচ্ছে?'

'তদন্ত হচ্ছে। যাচ্ছেও কিছু কিছু।' দোকানি হাঁটু মুড়ে, দু হাত দিয়ে চেপে ধরলো, 'তা না যাবেই বা কেন বলেন? ঠাকুরের নামে নিজেরা কনুই ডুবিয়ে খাবে, আর ঠাকুর দাঁতে কাটি দিয়ে পড়ে থাকবেন জঙ্গলে। এত পাপ সয়?'

খুব যুক্তিযুক্ত কথা। একে বলে, পো'র নামে পোয়াতি বর্তায়। ঠাকুর দাঁতে কাটি দেন কিনা, সে-রহস্য অজানা। ঠাকুর বলে যখন মেনেছো, তখন তাঁর সেবা করতে হবে। তাঁকে খরচের খাতায় রেখে, নিজের খরচা বাঁচানোটা অনধিকার চর্চা। হয় ছাড়ো, নয় রাখো। তিক্ত চা কোনোরকমে শেষ করে বললাম, 'অন্যায় কথা।'

'বলেন।' দোকানি হাতে মোড়া হাঁটু ঝাঁকালো, 'ঠাকুর তো তোমার কিছু নিয়ে পালাচ্ছেন না, দিতেই আছেন। ওঁয়াকে কেন অচ্ছেদ্দা? অবশ্য সকলের কথা বলছিনে। অনেকে নিত্য সেবাও করে।'

এই সময়ে ইস্টিশনে ঘন্ ঘন্ ঝন্ ঝন্ ঘণ্টা বেজে উঠলো। ঝটিতি উঠে দাঁড়ালাম। ওদিকে আমার ঠাকুরের ঘণ্টা বেজে উঠেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'চায়ের দাম কতো?'

'দশ পয়সা।' দোকানি বললো, 'ব্যস্ত হবেন না। গাড়ি এখনো ব্যান্ডেলে নয় তো বাঁশবেড়েয়। এবার টিকেট ঘরের জাল্‌না খুলবে।'

সে-ভাবনা আমার নেই। টিকেট আমার পকেটে। আইনত একটা অপরাধ করেছি। সেটা ব্রেক জার্নি। কিন্তু মূলে ফাঁকি দিইনি। বিনা টিকিটের যাত্রী নই। পকেট থেকে দশটা পয়সা বাড়িয়ে দিলাম।

'পান খাবেন না?' পয়সা না নিয়ে দোকানি বিশেষ সমীহ্ করে জিজ্ঞেস করলো। বললাম, 'পান খাইনে'। 'পয়সা রাখেন। একটু চা বই তো নয়।' দোকানি নেমে দাঁড়ালো। শূন্য দাঁতের মাড়িতে আর হলদে চোখের হাসিতে যেন গুপ্ত রহস্য। গলা নামিয়ে বললো, 'চোখ কান খোলা রেখে খোঁজ খবর লিবেন। আপনাকে আর আমি কি বলব। পেরায়ভেট দেবোত্তরে অনেকেই এক কুড়ি এগার বিঘে দেখিয়ে দেয়। কজনায় আর দু কুড়ি এগার বিঘে দেখিয়ে উকিল ম্যানেজার রেখে দেবোত্তর এস্টেট চালায় বলেন? খরচ করতে হবে না?' কালো মুখে হাসি বিস্তৃত হলো।

এ দেখছি, শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। আমাকে গরমেণ্টের লোক বলে সে ধরেই নিয়েছে। কী দেখে? হ্যাট কোট বুট কিছু নেই। ধুতি পাঞ্জাবী কাঁধে ঝোলা। চোখে কালো ঠুলি। সামনে বসে ঠোঙা থেকে চিঁড়ে মুড়কি খেলাম। বাকিটুকু ঝোলায় রাখতে ভুলিনি। কখন কী অবস্থায় পড়তে হবে কে জানে। সঞ্চয় থাকা ভালো। তবুও ভবী ভোলবার না। বাবু নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী। তার চোখকে ফাঁকি দেবে? এ মানুষের ভুল ভাঙানো সম্ভব না। হেসে বললাম, 'তাই বুঝি? কিন্তু পয়সাটা নিন।'

দশ পয়সার মুদ্রাটি একরকম হাতে গুঁজেই দিলাম। বেরিয়ে এলাম তাড়াতাড়ি। দেবোত্তর সম্পত্তির হিসাব নিকাশ তার নখদর্পণে। যার বিন্দুবিসর্গ বুঝি না। একরকম বুঝিয়ে তো দিল। সংসারের সীমায় এটাই তো স্বাভাবিক। যে যার নিজের মতো জগৎকে দেখে। রাস্তার ধারে ঝুপড়ি করে বসে আছে। আসল টান জমির দিকে। মাটি তার নাম। রক্তের টান। আমাকে চিনতে ভুল করতে পারে। কিন্তু মানুষ

হিসাবে তাকে খারাপ বলতে পারি না। এটাই তার খাঁটি পরিচয়। অতএব, মানুষকে নম, নমঃ।

দোকানি গাড়ির কথাও কিছু ভুল বলেনি। কু ঝিক ঝিক আওয়াজ বেশি। গতি পেট বোঝাই ময়ালের মতো। এলো কুড়ি মিনিট পরে। একটাই প্ল্যাটফর্ম কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। যাত্রীর ভিড় বেশ। জায়গা অবিশ্যি একটা পাওয়া গেল। কিন্তু ছোট একটা পুঁটলি কোলে এসে পড়লো। পাশের মায়ের কোলের শিশুটির নজর আমার কাঁধের ঝোলায়। থাবা দিয়ে সেটাকে ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা। মা বিড়ি ফুঁকতে ব্যস্ত। আর রেলগাড়িতে ফেরিওয়ালা কোথায় নেই। যাবতীয় খাদ্যবস্তু থেকে, ওষুধ পথ্যি কিছু বাদ নেই। আমাকে লক্ষ রাখতে হচ্ছে ইস্টিশনের দিকে।

প্রথমে এলো খামারগাছি। ইস্টিশনের থেকে হাট দূরে। কিছু লোক ওঠা নামা করলো। ভিড়ের কিছু কম হলো না। পুব দিকে তাকিয়ে, মনে হলো ওদিকেই বোধহয় বাসনা, সিজা গ্রাম। খামারগাছির পরের ইস্টিশান জীরাট। লোকে বলে জিরেট। কেতাবের খবর, 'জিরায়ৎ' থেকে জীরাট। জিরায়ৎ বোধ হয় ফার্সি শব্দ। যার অর্থ নাকি আবাদী বা ফসলের জমি। তা হলে এমন কিছু প্রাচীন গ্রাম না। পাঠান আমলে জঙ্গল কেটে বসত। নাম করার মতো দুই বন্ধু, অভয়রাম আর রামকানাই, এ গ্রামে এসেছিলেন। বয়স তখন উভয়ের সত্তর। জিরেটের পাশে কেলেগড় গ্রাম। ভালো কথায় কালীগড়। সেখানে সিদ্ধেশ্বরীর পূজারী কালীনাথ অধিকারীর দুই কন্যাকে দুজনে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু অভয়রাম ঘোর শাক্ত। বীরাচারী। রামকানাই নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর বংশধর। পরম বৈষ্ণব। অভয়রাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কালী। রামকানাই রাধাগোপীনাথ।

পরবর্তী সংবাদ বাঙলার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের পৈতৃকবাস ছিল এখানে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যাঁর নাম। আদিবাড়ি অবিশ্যি দিগসুই গ্রামে। মুখুজ্জেদের এক পুরুষ রামজয় বিয়ে করেছিলেন জিরেটের গোস্বামী পরিবারে। কারণের হদিশ মেলে না। রামজয় মারা গেলে, তাঁর ছেলে বিশ্বনাথ, কেন বিধবা মায়ের সঙ্গে চলে আসেন জিরেটে। বিশ্বনাথ হলেন আশুতোষের ঠাকুর্দা। বিশ্বনাথের চার ছেলে। দুর্গাপ্রসাদ হরিপ্রসাদ গঙ্গাপ্রসাদ রাধিকাপ্রসাদ। আর এখানেই আমার মনে একটা ঠেক।

কলকাতার নিকট মফস্বলে বরাবর একটা গল্প শুনে এসেছি। আশুতোষ মুখুজ্জের সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। সেই সূত্রেই নাকি দুই বন্ধুর কবুল, তোষ-এর বংশধরদের নাম অতঃপর থেকে প্রসাদযুক্ত হবে। আর প্রসাদ-এর সঙ্গে তোষ। সেই কারণেই নাকি আশুতোষের বংশধরেরা সব প্রসাদ। আর হরপ্রসাদের বংশধরেরা বেবাক তোষ। হালফিলের পরিচয়ে সেটা জানা যাচ্ছে বটে। তবে গল্পটা বোধহয় গল্পই। জগৎ জুড়ে ওটাও বোধহয় জীবলীলার ধর্ম। গল্প বানাতে চায় সবাই। নইলে আশুতোষের জন্মের আগেই, তাঁর বাবার নাম গঙ্গাপ্রসাদ হতো না। আরও এক

কথা। আশুতোষ যখন তাঁর বিধবা কন্যার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তখনই নাকি হরপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর আড়ি। হরপ্রসাদের বিধবা বিয়েতে আপত্তি। এটা ঘটলেও ঘটতে পারে। হরপ্রসাদ—বঙ্কিমচন্দ্র নৈহাটির অধিবাসী। উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

কিন্তু আশুতোষ জিরেটে আর বিধবা কন্যা কমলার বিয়ে আর এক ঘটনা। আশুতোষের নিজের গাঁয়ের কুলীন বামুনরা বিধবা বিয়ের কথা শুনেই দৌড়। অতএব আশুতোষেরও দৌড়। সেই যে জিরেট ত্যাগ করলেন, আর একদিনের জন্যও আসেননি। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গোঁ তো। সেই থেকে জিরেটের বাড়ি অনেককাল জঙ্গলের গ্রামে ছিল। এখন সাফসুরত করে 'আশুতোষ স্মৃতি মন্দির।'

'আরে ধেত্তরি, সরে বসবে তো।' একজনের বিরক্ত ঝাঁজ বাজ শোনা গেল, 'বলাগড় এসে গেল, নামতে দেবে না?'

বলাগড়? লাফিয়ে উঠতে গিয়ে বাংকে মাথার ঠোক্কর। কোলের কাছে ধুতি ভেজা। কারণ কী? শিশুটির প্রাকৃতিককর্ম। বোধহয় কাঁধের ঝোলাটা বাগাতে পারেনি বলেই। কোলের ওপর পুঁটলিটা তুলে নিল পার্শ্ববর্তিনী। গাড়ি ইতিমধ্যে প্ল্যাটফরমে ঢুকেছে। ব্যস্ততার কিছু ছিল না। ভিড় যা, তা গাড়ির মধ্যেই। যাত্রী ওঠা নামার তেমন ভিড় হুড়োহুড়ি নেই। গাড়ির মেঝেয় বসা নরনারী, মালপত্র ডিঙিয়ে নেমে এলাম। আমার পিছনে এক চৈত্র গাজনের সন্ন্যাসী। গলার নতুন গামছাটা মাসের শেষে পুরনো দেখাচ্ছে। হাঁটুর ওপরে গেরুয়া বস্ত্র। এক হাতে মালসা, কাঁধে ঝোলা। আর এক হাতে ছোট একটা ত্রিশুল। গাড়ি থেকে নেমে বললো, 'জয় বাবা, বুড়োশিবের জয়।'

ফিরে তাকালাম। দৃষ্টি তার ইস্টিশনের ঘরের দিকে। এক মুখ কালো দাড়ি। গোঁফ জোড়া তার চেয়ে বড়। মুখে উপোসের ছাপ। ভিন্ গাঁয়ে ভিক্ষে সেরে ফিরলো বোধহয়। অথবা এলো নতুন জায়গায়। বুড়োশিবের আওয়াজ দিল। কিন্তু নড়লো না।

আমি পা বাড়ালাম। ইস্টিশনের ঘরের দিকে। যে কজন যাত্রী নেমেছিল, তারা কোথায় হারিয়ে গেল। গাড়ি কু দিয়ে এমন গর্জন করলো, যেন আকাশ পাতাল ফুঁড়ে ছুটবে। অথচ গতি সেই পেট বোঝাই ময়ালের মতো। ইস্টিশনের ঘরটা প্ল্যাটফরমের গায়ে। ডুমুরদর মতো নয়। ফাঁকা প্ল্যাটফরমটা রোদে পুড়ছে। পুড়তে পুড়তে ঝিমোচ্ছে। সকালের সেই বাতাসটা কোথায় যেন থম্‌কে আছে। নিঝুম দুপুরটাকে হঠাৎ হঠাৎ কোকিলের ডাক চমকে দিচ্ছে। অন্যথায় ঘুঘুর ডাকে দুপুর যেন বিষণ্ণ আতুর। এ ডাকটাই এক এক সময়ে, শোকাতুরা জননীর সেই কান্নার কথা মনে করিয়ে দেয়, 'খোকা কোথা...খোকা কোথা...'। তখন ঘুঘুর নাম হয়ে যায় 'খোকা কোথা পাখি।'

ইস্টিশনের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক। ধুতির ওপর হাফশার্ট। লক্ষ আমার দিকে। সম্ভবতঃ ইনি টিকেট সংগ্রাহক। পকেট হাতড়ে টিকেট বের করলাম। ভদ্রলোক হাত বাড়ালেন। টিকেট নিয়ে দেখলেন। ভুরু কুঁচকে উঠলো, 'এ তো গুপ্তিপাড়ার টিকেট। এটা বলাগড়।'

বললাম, 'জানি। আগেই নেমে পড়লাম।'

টিকেটের গন্তব্য ছাড়িয়ে যাইনি। অতএব দোষ বোধহয় ঘটেনি। তবু গুপ্তিপাড়ার টিকেট নিয়ে বলাগড়ে নামলে, অবাক হবার কথা। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'যাবেন কোথায়?'

'শ্রীপুর।'

'তা হলে গুপ্তিপাড়ার টিকেট কেন?'

বেকায়দার প্রশ্ন। কিন্তু যুক্তিযুক্ত। আসলে খুঁটির দড়িটা লম্বা করে রেখেছিলাম। সীমানা যেখানে হোক, চরে বেড়াতে পারলেই হলো। কিন্তু সে-কথা বোধহয় এক্ষেত্রে টেঁকে না। অতএব সেই ছল চাতুরি, 'কোনোদিন আসিনি তো, বুঝতে পারিনি। পরে শুনলাম, শ্রীপুর যেতে হলে বলাগড়ে নামতে হয়।'

'তা হলে আর এ টিকেট নিয়ে আমি কি করব।' ভদ্রলোক টিকেটটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, 'আপনার কাছেই রেখে দিন। গুপ্তিপাড়ার টিকেট বলাগড়ে জমা হয় না। আজই ফিরে আসবেন তো?'

বললাম, 'তাই তো ইচ্ছে।'

'তা হলে এই টিকেটেই গুপ্তিপাড়া চলে যাবেন।' আমার হাতে টিকেট ধরিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক হাঁকলেন, 'এই যে, যাচ্ছ কোথায়?'

পিছন ফিরে দেখি, বুড়োশিবের গাজনের সন্ন্যাসী। উত্তর দিকে হাঁটছে। হেসে বললো, 'যাব আর কোথায়? বাবাকে ডেকে ফিরছি।'

'ওই বলে নিত্যানন্দপুরে মেয়ের বাড়ি, অমুক বাড়ি ঘুরে আসছে।' কথাটা বললে আর একজন।

দেখলাম ভদ্রলোকের পিছনে, নীল হাফ প্যাণ্ট আর হাফ শার্ট পরা একজন। পোশাকে প্রমাণ, রেলের কর্মচারী।

ভদ্রলোক বললেন, 'সে কি আর জানি নে? চৈত্র মাসে এখন রোজই রেল গাড়িতে চাপতে হয়। কেন, আশেপাশের গাঁয়ে বাবার নাম করা যায় না?'

'রাম ছুতোরকে আপনি চেনেন না মাস্টারমশাই?' নীল কুর্তা হাসলো, 'ওকি আর বাবার নাম লিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়? ঘরে ওর অভাব কিসের? চোত্ মাসে সন্নেস লিয়ে শালা যত কুটুম বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। আজ নিত্যানন্দপুর, কাল বাঘনা পাড়া, পরশু দাঁইহাট।'

যার সম্পর্কে কথা হচ্ছে, সে ততক্ষণে উত্তরে অনেক দূরে। মাস্টারমশাই বোধহয় ইস্টিশন মাস্টার। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'যত সব ছ্যাঁচড়ার দল।'

নীল কুর্তা একবার আমাকে দেখে ভিতরে ঢুকে গেল। বাকি রইলো, বারান্দার ছায়ায় বেঞ্চিতে একটা ঘুমন্ত মানুষ। তার নিচে একটা কুকুর। আমি টিকেট হাতে নিয়ে ইস্টিশনের বাইরে এলাম। পুবের কাঁচা রাস্তাটার ধারে গোটা দুই তিন চালাঘর। বাঁ দিকেও একটা রাস্তা গিয়েছে। সেদিকে আঁসশ্যাওড়া ঝাঁটি বাবলার জঙ্গল। পাশে

একটা মাঠ। একটা চালা ঘরে চায়ের দোকান। খরিদ্দার নেই। দুজন লোক বসে আছে। আর একটা ঘরও তাই। তবে ক্যালেন্ডার আর সামান্য কিছু মনোহারি বস্তুতে একটু নজর কাড়ে। বাকি আর একটা ঘরে ঝাঁপ অর্ধেক বন্ধ। একজন গাজনের সন্ন্যাসী বসে বিড়ি বাঁধছে। যানবাহনের কোন প্রশ্নই নেই। ডান দিকে, গাছতলায় একটা গরুর গাড়ি মাটিতে মুখ নামানো। খুঁটিতে বাঁধা বলদ দুটো ঘাস চিবোচ্ছে।

কোকিলের ডাক থামলেই, ঘুঘুর বিরহী স্বর। চড়ুইয়ের ডাক যেন ঘুঙুরের ঝংকার। দূরের গাছপালার ফাঁকে, দু চারটি ঘর দেখা যাচ্ছে। একটা পাকা দোতলা বাড়ির অংশও। কিন্তু যাবো কোন্ দিকে? সোজা পুবে? না বাঁ দিকের উত্তর পুবে? কেমন একটা ধারণা ছিল, বলাগড় বেশ সম্পন্ন গ্রাম হবে। কিন্তু সেরকম কিছু দেখছি না। হয় তো ভিতর দিকে আছে। পঞ্চমুণ্ডির আসনযুক্ত চণ্ডীমন্দির। গায়ে তার টেরাকোটার অপরূপ কাজ। আছে রাধাগোবিন্দর মন্দির। জিরেট বলাগড়, দু গাঁয়েই বৈষ্ণবদের ঠেক্ আছে। বংশধরেরা সবই সেই নিত্যানন্দ কন্যা গঙ্গাদেবীর।

আমি দোকানের দিকে পা বাড়ালাম। পিছনে শোনা গেল, 'জয় বাবা বুড়োশিবের লাগি-ই-ই।' তাকিয়ে দেখি সেই গাজনের সন্ন্যাসী। নাম যার রাম ছুতোর। ছুতোর নিশ্চয় পদবী না। পেশাগত পরিচয়। ফিরে তাকিয়ে দেখি, সন্ন্যাসীর কালো গোঁফ-দাড়ির ভাঁজে আর ছোট চোখে হাসি। আমার দিকেই এগিয়ে এলো। দোকানের লোকেরা তার দিকে তাকালো। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। কিছু বলছে। কেবল বিড়ি বাঁধছে যে সন্ন্যাসী, সে নির্বিকার। রাম ছুতোর আমার কাছে এসে দাঁড়ালো, 'ইস্টিশান মাস্টার আপনাকে ধরেছিল বুঝি?'

'ধরবে কেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

রাম ছুতোর চতুরের হাসি, একটু বিব্রত হলো, 'না দেখলাম কিনা, আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।'

'দাঁড় করিয়ে রাখেনি তো। আমার গুপ্তিপাড়ার টিকেট, নেমেছি এখানে।'

রাম ছুতোরও অবাক হলো, 'অ! যাবেন গুপ্তিপাড়া, নেমে পড়লেন এখানে? আমি ভাবি ভদ্রলোক মানুষকে কেন মাস্টার দাঁড় করালে।'

আর তাই রাম ছুতোর আমাকে তার দলের দলী ভেবে নিয়েছে। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'তা বাবু, এখেনে লেমে পড়লেন কেন?'

বললাম, 'শ্রীপুর যাবো। বলাগড় গ্রামটা কি ভেতরে?'

'বলাগড়?' রাম ছুতোরের ছোট চোখে বিস্ময়, 'বলাগড় তো এখেনে লয়। এটা ইস্টিশন। গেরাম তো আধ কোশ দক্ষিণে, জিরেটের গায়ে।'

চমৎকার। এ জায়গায় সে-জায়গা নেই। ইস্টিশনের নাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'তা হলে এটা কোন্ গ্রাম?'

'এটাকে হাট গোবিন্দগঞ্জ বলতে পারেন।' রাম ছুতোর বললো, 'ছিরপুর মৌজা আপনি কি বলাগড়েও যাবেন?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না, শ্রীপুরেই যাবো। কোন্ পথে যাবো?'

রাম ছুতোর সামনের রাস্তার দিকে তাকালো। আর একবার পুব-উত্তরের দিকে দাড়ি চুলকে বললো, 'দু দিক দিয়েই যেতে পারেন। তবে এই পথেই সোজা যান কিছুটা গেলে, বাঁ দিকে রাস্তা পাবেন। আমিও যাবো।' সে আমার আপাদমস্তক দেখলো। অনুসন্ধিৎসু চোখে সমীহ, 'কার বাড়িতে যাবেন বাবু?'

বললাম, 'কারো বাড়িতে না, এমনি একটু বেড়াতে যাবো।' বলেই যেন ভিজে কাপড় লেগে গেল। এও আবার গরমেণ্টের লোক ভেবে বসবে না তো! ভাবলে অবিশ্যি কিছু করার নেই। রাম ছুতোরের চোখে সন্দেহ, মুখে হাসি, 'আমি ভাবলাম বুঝি বাবুদের কারুর বাড়ি যাবেন। আপনি এ পথে এগোন, আমি আসছি।'

কিন্তু আমার পেটের চিঁড়ে জল চাইছে। চায়ের দোকানের সামনে গিয়ে বললাম, 'একটু খাবার জল পাবো ভাই?'

দোকানের দুজনেই কৌতূহলী চোখে দেখছিল। একজন বেঞ্চি থেকে উঠে গেল। রাম ছুতোর গেল, আর এক সন্ন্যাসীর কাছে। চায়ের দোকানের আর একজন জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাবেন?'

বললাম, 'শ্রীপুর। কতো দূর হবে?'

'মাইলটাক।' লোকটি আমার আপাদমস্তক দেখলো, 'সোমড়াবাজারে নেমেও যেতে পারতেন। তবে উনিশ আর বিশ।'

অন্য লোকটি একটি কাঁচের গেলাস ধুয়ে, ঘটি থেকে জল ভরে দিল। ছোট গেলাস, তলায় চায়ের খয়েরি দাগ স্থায়ী হয়ে গিয়েছে। এক গেলাসে হলো না। আর এক গেলাস নিলাম। পেটের চিঁড়ে উঠলো। ধন্যবাদের প্রশ্ন নেই। মনে মনে বললাম, 'জয় হোক।'

পুবের রাস্তায় পা বাড়ালাম। দেখলাম বিড়ি বাঁধছে যে সন্ন্যাসী, রাম ছুতোর তার সামনে বসে কী বলছে। বিড়ি কারিগর সন্ন্যাসী মাথা ঝাঁকিয়ে শুনছে। মুখে কথা নেই।

রাস্তায় একটা লোক চোখে পড়ে না। নিঝুম গ্রামের দুপুর। নিদাঘ বেলা। ভূতে মারে ঢ্যালার মতো। ডান দিকে বাগান গাছপালা। মাঝে মধ্যে দু-একটা মাটির ঘর, খড়ের চাল। গেরস্থের দেখা নেই। ঝোপে ঝাড়ে চড়ুই দলের ঝাঁপাঝাঁপি। কুহু ডাকের বিরতি নেই। মাঝে মাঝে বুলবুলির শিস কাছে পিঠে। হঠাৎ হঠাৎ দুর্গা টুনটুনির চড়া শিস। রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলার উপায় নেই। স্যাণ্ডেল শুদ্ধু পায়ের পাতা ডুবে যাচ্ছে ধুলায়। কোথায় যেন শুনেছিলাম, বর্ষায় কর্দমাক্ত, বাকি সময় ধুলাসিক্ত। ধুলি সিক্ত কেমন করে হয়, জানি না। সিক্ত লিপ্ত কিছুই না। ধূলি গাঢ় পথ। গরুর গাড়ির চাকার দাগ। পথের ধারের ঘাসগুলোও ধুলিধুসর। তবু তার ওপর দিয়েই চলতে সুবিধা। সূর্য পশ্চিমের ঢালে। রোদ বেশ চড়া। সকালের বাতাসটা কোথায় বন্দী হয়ে আছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একটা দমকা হাওয়ার ঝাপটা

আসছে। তখন আমিও ধুলায় ধূসরিত। নাকে মুখে চাপা দিয়েও নিষ্কৃতি নেই। দাঁতে কিচ্ কিচ্ করে। শুকনো পাতা উড়ে যায় গায়ে ঝাপটা দিয়ে।

বাঁ দিকে ছোট একটা পাড়া। গায়ে গায়ে বেশ কিছু মাটির ঘর। এক ঘরের দাওয়ায় বসে দুই নেংটি পরা জোয়ান আর বুড়ো। সামনে দুটো মেটে কলসী। পাশে একটা ল্যাংটো শিশু ঘুমোচ্ছে। দু'জনের মধ্যে কিছু কথা হচ্ছিল। আমাকে দেখে কথা থামালো। বুড়ো হঠাৎ টলতে টলতে নেমে এলো। নিচু হয়ে দু'হাত কপালে ঠেকালো। আমাকেই নাকি? আশেপাশে আর কারোকে তো দেখতে পাচ্ছি না। তারপরে আবার মুখ তুলে, দন্তহীন মাড়িতে লাজুক হাসি। কালো মুখে লাল চোখ। দ্রব্যগুণে নজরে ভুল। এ ভুল ভাঙাতে যাওয়া আর এক বিপত্তির সম্ভাবনা। অতএব আমারও কপালে দুই হাত। পা থামাইনি। তারপরেই খিলখিল হাসি। রমণীর স্বর। নিদাঘ বেলায়, সেই হাসিতে কেমন একটা নিশির ডাকের অলৌকিকতা। দেখি, অন্য ঘরের দাওয়ায় দুই রমণী। একজনের ডুরে শাড়ির বুকের আঁচল খসা। কোলের শিশুর মুখে, একটি ভরাট অমৃতের বোঁটা। অপরটি উদাস। অচেনা মানুষ দেখে, আবৃত করার কোনো উদ্যোগ নেই। চুল তার খোলা। আর একজন তার গায়ে লেপ্‌টে বসে। খোলা চুলের ওপর দু হাত ঢুকিয়ে বসেছে। উকুন মারা হচ্ছে। পাশে পড়ে আছে এক গুচ্ছ বাঁশের সরু কাটি আর ধারালো হাত দা। তাদের শরীরে বা মাটির দাওয়ায় তেমন নিকানো লেপা মোছা, চাকচিক্য নেই। একটু যেন ধুলা ধূসর। অথচ নিতান্ত শ্রীহীন না। জোড়া গলার হাসি বেজেছে ঐ দাওয়া থেকেই। পেরিয়ে যাবার আগে শুনতে পেলাম, 'বুড়ো সেই সকাল থেকে খাচ্ছে।'

বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের জীবলীলার কথা মনে পড়ে গেল। অলস বেলার একটি ছবি। আরও কিছু দূর এগোতেই, বাঁ দিকে একটা রাস্তা চোখে পড়লো। দাঁড়ালাম। দেখছি, একটু দূরে, গাছতলায় একটা চালা ঘর। সেখানে তিন চারজন বসে আছে। শ্রীপুরের রাস্তা কি বাঁ দিকে? জিজ্ঞেস করার জন্য চালা ঘরের দিকে পা বাড়াতে গেলাম। পিছন থেকে শোনা গেল, 'ওদিকে লয় বাবু, বাঁয়ে চলেন।'

ফিরে দেখি রাম ছুতোর, গাজনের সন্ন্যাসী। একটু আশ্বস্ত হলাম। বাঁয়ের পথ ধরে চললাম। এ কাঁচা রাস্তা তেমন চওড়া না। তবে গরুর গাড়ির চাকার দাগ আছে। ধুলা একটু কম। গাছপালা নিবিড়। রোদের থেকে ছায়া বেশি।

'মাস্টারমশাই আর ঘণ্টাওয়ালা কী বলছিল বাবু?' রাম ছুতোর কিঞ্চিৎ দূরত্ব বাঁচিয়ে হাঁটছে।

কী জানতে চাইছে, বুঝি। তবু জিজ্ঞেস করি, 'কী ব্যাপারে?'

'তোমার কথা কিছু বলছিল না?' রাম ছুতোরের মুখে হাসি।

বললাম, 'হ্যাঁ। আপনি বিনা টিকেটে কুটুমবাড়ি ঘুরে বেড়ান, সে-কথা বলছিল।'

'আমাকে আপনি করে বলছেন বাবু?' রাম ছুতোর ভারি লজ্জিত হলো, 'ছি ছি ছি। বলবেন না। মুখ্য সুখ্যু মানুষ বাবু, গতরে খেটে খাই। জাতে ছুতোর, তবে

মাঠের কাজই বেশি করি। ছিটে ফোঁটা জমি আছে। বাবুরা কেউ আমাদের আপনি বলে না।'

এটাই হয় তো রীতির কথা। রেওয়াজ যাকে বলে। কিন্তু ভিন্ দেশী লোক আমি। চেনা শোনা থাকলে আলাদা কথা। আপনি বললেই যে সম্মান দেখানো হয়, সেটা যথার্থ না। ওটা ওপর চট্‌কা ভদ্রতা। সম্পর্ককে নিকট করে না। আমি অনায়াসেই জিজ্ঞেস করলাম, 'আজ নিত্যানন্দপুরের মেয়ের বাড়ি যাওয়া হয়েছিল বুঝি?'

'ওই ঘণ্টাওয়ালা তারক বলল বুঝি?' রাম ছুতোর হেসে আওয়াজ দিল, 'ঠিকই বলেছে। ত বাবু, একটা কথা। সব সময় তো আর বিনি টিকিটে যাইনে। এখন সন্নেস লিয়েছি। সন্নেসির কি টিকিট লাগে?'

যুক্তির অভাব নেই। গৃহস্থ এখন এক মাসের সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর তো টাকা কড়ি থাকে না। তবে টিকেট কাটবে কেন? আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। কালো চকচকে চোখে কৌতুকের ঝিলিক। বললাম, 'তা আইনকানুন মানতে গেলে—।'

'সাধু সন্নেসিদের আবার আইন কানুন কিসের বাবু?' আমাকে বাধা দিয়ে, কাছে চলে এলো রাম ছুতোর, 'কত সাধু সন্নেসিরা রেলে হিল্লী দিল্লি করে। তারা কি টিকিট কাটে? আমি তো এখন সন্নেসি।'

রাম ছুতোরের এটাই যখন সিদ্ধান্ত, তখন কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তর্ক করতে গেলে বলতে হয়, সে তো ঘর বিবাগী সন্ন্যাসী না। গাজনের সন্ন্যাসী নিয়ে বিনা টিকেটে কুটুমবাড়ি বেড়ানোটা তার মতো গৃহীকে মানায় না। সে-কথা বলা বৃথা। এক মাসের জন্য হলেও, সন্ন্যাসী তো। অতএব তার বিনা টিকেটে ভ্রমণের অধিকার আছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'দাঁইহাট আর বাঘনা পাড়ায় কে আছে?'

'অ্যাঁ?' রাম ছুতোর যেন ঠেক খেল। তারপরে হা হা করে হেসে বাজলো, 'ওই তারক বলছিল বুঝি? ও শালা আমার সবই জানে। দাঁইহাটে শ্বশুরবাড়ি, বাঘনাপাড়ায় বোনের বাড়ি। এই এক মাস একটু কুটুম্বিতে সেরে লিই। সংক্রান্তির পর থেকেই তো কাজ। আর তো বেরতে পারব না।' সেয়ানা হতে পারে, কিন্তু সরল স্বীকারোক্তি। এদিকে পথ ফুরায় না। এক মাইল কি আসিনি। জিজ্ঞেস করলাম। 'শ্রীপুর আর কতো দূর?'

'কত আর? এখেন থেকে আর আধ কোশটাক হবে।'

আধ কোশ। অর্ধ ক্রোশ মানে তো এক মাইল? অথচ ইস্টিশনে শুনে এলাম শ্রীপুরের দূরত্ব এক মাইল। এই শ্রীপুরের কথা শুনেছিলাম প্রথমে এক বন্ধুর কাছে। সাত আট বছর আগে। তখন বন্দুকের কারখানায় কাজ করতাম। সহকর্মীর পদবী ছিল মুস্তোফি। তাদের বাড়ি বর্ধমানের কোনো গ্রামে। শ্রীপুরের মুস্তোফিদের মন্দিরের কথা সে বলেছিল। এবারে আমার যাত্রা আসলে বর্ধমানেরই এক গ্রামে। পথে দু এক জায়গায় ঠেক দিয়ে যাওয়া। এই ঠেক দিতে গিয়ে ঠেকায় না পড়ে যেতে হয়।

একটা জায়গায় এসে পথ দু দিকে বাঁক নিয়েছে। রাম ছুতোর বললো, 'আপনি

এই বাঁয়ে চলে যান। আর বেশি দূর লেই। আমি যাব ডাইনে। গোবিন্দগঞ্জের ছুতোরপাড়ার আমার বাড়ি। সোজা পথে যেতে পারতাম। তা কি মনে হল, আপনার সঙ্গে একটু ঘুরে গেলাম।'

থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। হঠাৎ নিজেকে কেমন একলা মনে হলো। গাজনের সন্ন্যাসী কপালে দু হাত ঠেকিয়ে নিজের পথ ধরলো। আমি এখনও গ্রামের বাইরে। শস্যহীন মাঠ দেখা যাচ্ছে, গাছপালার আড়ালে। সামনে একটা পুকুর। ঘাট বলতে কিছু নেই। জলে সবুজ শ্যাওলার আস্তরণ। রাস্তার দু পাশে ঘন ঝোপ জঙ্গল।

বাঁয়ের পথে মোড় নিয়েছি। সমবেত নিচু স্বরে মেয়ে গলার গান ভেসে এলো। ভাষা বুঝতে পারছি না। ঘোর দুপুরের ঘোরটা তখনও একেবারে কাটেনি, বেলা যদিও ঢলে আরও পশ্চিমে। এই মুহূর্তে, নির্জন ঝোপ জঙ্গল মাঠের পথে গান গায় কোন্ রমণীরা? শরীর আছে তো তাদের? নাকি অশরীরিণী? গানের সুরে তেমন ওটা নামা নেই। একটানা সুরে একটা দোলার ঢেউ আছে। বাউল কীর্তন ঢপ না। জারি সারি ভাটিয়ালি না। অথচ একটানা সুরে যেন মাটিতে গন্ধ। কী একটা অলৌকিক মোহ রমণীদের নিচু গানের সুরে। নিদাঘ বেলার নির্জন নিশি না তো?

আরও কয়েক পা যেতেই, শুকনো পাতার খস্‌খস্। বাঁ দিকে একটি চিত্র? শাড়ির আঁচলে গাছ কোমর বাঁধা তিন যুবতী। কালো তাদের রঙ। মাথার চুলে ফুল গোঁজা। তিনজনের হাতে হাত ধরা। সরু পায়ে হাঁটা পথে এগিয়ে আসছে। দেখলেই চেনা যায়, ওরা সাঁওতালি। বেশ খানিকটা পিছনে জনা কয়েক পুরুষ। হাতে তাদের পুঁটলি, বাঁশ।

যুবতীরা আমাকে দেখলো আচমকা। আমিও দেখলাম। তাদের গানের সুরে একটু ভাঁটা পড়লো। কিন্তু একেবারে থেমে গেল না। মুখে ফুটলো সলজ্জ হাসি। নিজেদের সঙ্গে একবার দৃষ্টিবিনিময়। যেমন আসছিল, তেমনি আসতে লাগলো। এবারের যাত্রায় দেখছি, এমনি সব রূপের ছড়াছড়ি। বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের ভাষায় প্রকৃতির গভীরে জীবলীলা। হয় তো কোনো কাজ সেরে ফিরছে। চৈত্রের ধুলা, ঝোপ ঝাড় গাছের আর কাঁচা আমার গন্ধে মাখামাখি। ওরা ডেকেই চলেছে, কুহু কুহু।

রঙ তুলি থাকলেও কি ধরে রাখা যেতো? বোধহয় যেতো। আক্ষেপে লাভ নেই। কেবল আর্ত প্রার্থনা, দৃষ্টি শ্রুতি কিছুই হারাতে চাই না। হারালে এ রূপ দেখা হতো না। গান শোনা হতো না। যদি বা, ভাষা বুঝতে পারছি না। ভাষা ওদের চোখে মুখের সলজ্জ হাসিতে। চলার অলস ছন্দে।

রাম ছুতোর চলে যাওয়ায়, মনটা খারাপ হয়েছিল। এখন আর হচ্ছে না। সামনে এক প্রাচীন গ্রাম। বন জঙ্গল কাঁটা ঝোপে ভরা। পুরনো দিনের সমৃদ্ধির স্মৃতি ভারে বিষণ্ণ। অথচ আমার মনটা ভরে উঠছে এক অনির্বচনীয় আনন্দে। এগিয়ে চলি। পিছনে ওদের গান বাজতে থাকে।

মুস্তোফিদের গড় বেষ্টিত বৃহৎ অট্টালিকার গায়ে এখন কালের থাবা। গড় জঙ্গলময়। কিন্তু দীঘির জল কালো। দীঘি ছাড়াও পথ চলতে ঘাট বাঁধানো পুকুর চোখে পড়ে আশেপাশে। ঘাটগুলো শ্যাওলা ধরা, ভাঙা ফাটা। ফাটল দেখলে ভয় লাগে। তবু, সেই সিঁড়ি ভেঙেই অনায়াসে বিকেলের গা ধোয়া বাসন মাজা চলছে।

মুস্তোফি না, মুস্তৌফি। বাদশাহী খেতাব না। নবাবের রাজস্ব বিভাগের একটি পদ। কানুনগো বলা চলে। ইংরেজিতে বোধহয় অডিটর। ইতিহাসের পাতায় এ বংশের উল্লেখ আছে। আসল পদবী মিত্র। পরে মিত্র-মুঠ-মিত্র-মুস্তোফি। এখন কেবল মুস্তাফি। পলাশী যুদ্ধের সাতান্ন বছর আগে, মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকায়। ঔরঙজেবের ছাড়পত্রে, তিনি তখন দেওয়ান। তারও অনেক আগে, শায়েস্তা খাঁর আমলে রামেশ্বর মিত্র ঢাকার মুস্তৌফি দপ্তরের প্রধান। তখন বাড়ি ছিল গঙ্গার ওপারে, উলায়। তাঁর ছেলে রঘুনন্দন উলা ছেড়ে এ পারে। কারণ বোধহয় একটাই। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে অসদ্ভাব। অন্য একটা ওজরও ছিল। গঙ্গা নাকি সরে যাচ্ছিল·উলার ডাঙা ছেড়ে। এ পারের নাম তখন আঁটিশেওড়া।

তার আগে রামেশ্বর গিয়েছিলেন দিল্লি। দরবার ঔরঙজেবের। মুর্শিদকুলি খাঁর সঙ্গে শাহজাদা আজিম উস্‌শানের হিসাব নিয়ে বিবাদ। সেই হিসাব মেটাতে রামেশ্বর ঔরঙজেব সকাশে। সম্রাট হিসাব দেখে চমৎকৃত, অতএব, 'তুমিই মুস্তৌফি' । খেলাত জায়গীর সবই দিয়েছিলেন। মহাশয়ের আরবী পারসী শিক্ষা ছিল। বড় ছেলে রঘুনন্দনও বাপকা বেটা। সংস্কৃত পারসী ভালো জানতেন। তবে মুস্তৌফির পদে আর বোধহয় যাননি। মতি ছিল ধর্মে কর্মে। সিদ্ধপুরুষ বলতো লোকে। আঁটিশেওড়ায় এসে গড় কেটে প্রাসাদ তাঁর তৈরি। খ্রিস্টাব্দ সতরো শো সাত। মন্দির করেছিলেন কয়েকটি। কুলদেবতা গোবিন্দজীউর মন্দির। কিন্তু শিব চণ্ডী বাদ ছিল না। বৈষ্ণব আর শাক্ত মেশামিশি। রাঢ়ের এই বৈশিষ্ট্য।

কোথায় যেন ঢং ঢং ঘণ্টা বেজে উঠেছিল। সেই সঙ্গে ছেলেদের কলস্বর। নিশ্চয় ইস্কুলের ছুটি। বন্দী মুক্তি। মন্তব্যটি ভালো না। অভিভাবকেরা ভ্রূকুটি করতে পারেন। সব কিছুতেই নিজেকে দেখি কী না। রূপের অঙ্গে স্বরূপ দর্শন। দুর্গামণ্ডপ কিংবা চণ্ডীমণ্ডপের দোচালার সামনে এসে যখন দাঁড়ালাম, প্রথম নজরে রসকসের মুখ। পিছনে টিং টিং ঘণ্টি। সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে রোগা লম্বা এক যুবক। চোখে কৌতূহলী জিজ্ঞাসা।

আমি তখন দোচালা মণ্ডপটির সামনে পাকা চাঁদনি দেখছি। চাঁদনির কড়িকাঠের মুখে অদ্ভুত রাক্ষস মূর্তি। মণ্ডপটির চালা ছিল এক সময়ে খড়ের। নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, এখন টিনের চালা। মণ্ডপের গায়ে কাঠের কারুকার্যে রূপের ছড়া। দেব দেবী যক্ষ রক্ষ রাক্ষস। বাঙলা দেশে নাবিতে পাথর নেই। তবু অনেক জায়গায় পাথরের মূর্তি দেখেছি। কিন্তু এমন কাঠ খোদাই কাজ দেখিনি। টিনের চালাটা একটু বেমানান।

ভিতরে উঁকি দিয়ে, রূপে বিভোর হয়ে যাই। কড়িকাঠে আর ফ্রেমেই কেবল মূর্তি খোদাই নেই। চালের নিচে বাঁশের চিকন কাঠি আর বেতের সূক্ষ্ম কাজ। যাকে বলে সিলিং, চিকন কাঠি আর বেতের সূক্ষ্ম কাজ বোধহয় সেইজন্যই। এখন প্রায় ধ্বংসোন্মুখ। কাঠের দেব দেবী, পুরাণের কাহিনী চরিত্রদের গায়ে কালের দোসর উইপোকা জায়গায় জায়গায় হানা দিয়েছে। একজন শিল্পীর কাজ না। অনেকের। কারোর নাম লেখা নেই। এ দেশে কোথাও কোনো মঠ মন্দিরের গায়ে শিল্পীর নাম লেখা থাকে না। থাকে কেবল প্রতিষ্ঠাতাদের। তা থাক। কিন্তু নাম না জানা, এই সব শিল্পী কারিগরদের এমন রূপের বাহার রক্ষা করবে কে?

চোখে ভেসে উঠছে, আরব সাগরের কূলে, বান্দ্রার পাহাড়ি টিলার ওপরে এক গৃহ। আধুনিক ইমারত। কিন্তু কাঠের কড়ি বরগায়, অপরূপ কারুকার্য। শুনেছিলাম, গুজরাটের কাথিয়াবাড়ের তক্ষণ-শিল্পীদের কাজ। স্বীকার করতে হবে, বাঙালী শিল্পীর হাতে জাদু ছিল বেশি। কোথায় আছে এই শিল্পীদের বংশধরেরা?

মণ্ডপের এক পাশ থেকে বেরিয়ে এলেন এক প্রৌঢ়। আদুর গা, গলায় পৈতা। পরনে ধুতি। চোখের চশমার কাঁচে জিজ্ঞাসা। দেখলেই সজ্জন বলে মনে হয়। কাছে এগিয়ে এলেন, 'কোথা থেকে আসছেন?'

বললাম। শুনে একটু যেন অবাক হলেন। আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কেবল এই সব দেখতে? আজই আবার ফিরে যাবেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ।' বলেই তাড়া লেগে গেল। গাছের শীর্ষে রোদের ঔজ্জ্বল্য কমে আসছে। প্রৌঢ় কি কুলদেবতা গোবিন্দজীউর পূজারী? তিনি সাইকেলওয়ালা যুবকের দিকে তাকালেন, 'তুমি নিয়ে এসেছ?'

'না, দেখলাম উনি একলাই আসছেন।' যুবক উত্তর দিল।

আমি কাছে একটি পাকা ঘর দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটি কী?'

'হোমঘর।' প্রৌঢ় বললেন, 'আর যজ্ঞকুণ্ড। ঐটি বোধন দালান।' আর একটি বাড়ি দেখালেন হাত তুলে। তিনিই ঘুরে দেখালেন গোবিন্দজীউর মন্দির। সামনে দুর্গা-দালানের মতো চওড়া চাতাল। মন্দিরের দরজা তিনিই খুললেন। কালো পাথরের গোবিন্দ, অষ্টধাতুর শ্রীরাধিকা। বিগ্রহের পায়ের নিচে লেখা দেখালেন, 'মিত্র দাসস্য।' মন্দিরের সামনে দোলমঞ্চ আর নহবতখানা। রাসমঞ্চও আছে। শ্রীপুরের রাসযাত্রায় বড় মেলা হয়।

গোবিন্দজীউর গল্প আছে। গঙ্গার ধারের জেলেপাড়ার মৎস্যজীবীদের জালে তিনি উঠেছিলেন। সেই পাড়া কিছু দক্ষিণে। মৎস্যজীবীরা গোবিন্দজীউকে নিজেদের গাঁয়ে রেখে, রঘুনন্দনকে খবর দিয়েছিল। রঘুনন্দন সেখান থেকে বিগ্রহ এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কিছুক্ষণ জেলেপাড়ায় ছিল। তাই সেই গ্রামের নাম রাখা হয়েছিল গোবিন্দগঞ্জ। পরবর্তী এক বংশধর গোবিন্দগঞ্জে একটি বাজার দিয়েছিলেন। সেই থেকে হাট গোবিন্দগঞ্জ। রাম ছুতোরের গাঁ।

আর এক কাহিনী, বর্গীর হাঙ্গামার সময় গোবিন্দজীউ গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হন। পরে মাছধরাদের জালে উঠে আসেন। দুই কিংবদন্তিতেই একটা মিল। গঙ্গার জল থেকে, মাছের জালে তাঁর আবির্ভাব। অসম্ভব না। সেটাই বোধহয় সত্যি।

দোলমঞ্চের উত্তরে বারোয়ারি গৃহ। কাছে শিব মন্দির। বুড়োশিবের মন্দির। সামনে মাঠ। আসন্ন গাজনের উৎসব এখানেই হবে। রাসের মেলাও এখানেই বসে। সংবাদ সবই প্রৌঢ় ব্রাহ্মণের। কিন্তু বেলা পড়ে আসছে। আর দেরি করা যায় না। সাইকেলসহ যুবক চলে গিয়েছে। ব্রাহ্মণ বললেন, 'শেষ ডাউন ট্রেনটা পাবেন কিনা সন্দেহ। লেট থাকলে পেয়ে যেতে পারেন।'

সেটাই দুশ্চিন্তা। বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের গোলকদাস বাবাজীর আখড়ার কথা মনে আছে। এখন সিদ্ধান্ত নাও। বলাগড় ইস্টিশন, না বাবাজীর আখড়া। বাঁড়ুজ্জে মহাশয়কে তিন মাথার মোড় মেনেছি। প্রৌঢ় ব্রাহ্মণকে বাবাজীর আখড়ার কথা জিজ্ঞেস করলাম না। বললাম, 'দেখি কী করি। সুখড়িয়া ঘুরে দেখবার ইচ্ছা ছিল।'

প্রৌঢ়ের চশমার কাঁচে অবাক ঝিলিক, 'সুখড়িয়া? সে তো বেশ দূরে। সেখানে এখন ঘুরতে যাবেন? আপনি কি খবরের কাগজের লোক?'

হেসে বললাম, 'না। এমনিই একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'তা হলে তো আপনার আজ ফেরা হবে না।' প্রৌঢ় বললেন, 'সুখড়িয়া যেতেও অন্ধকার হয়ে যাবে। না গেলেও ট্রেন পাবেন কি না সন্দেহ। রাত্তিরটা এখানেও থেকে যেতে পারেন। ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে।'

বড় নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। তবু একবার বাবাজীর আখড়াটা দেখবার ইচ্ছা। বললাম, 'গ্রামটা একটু ঘুরে দেখবো।'

'দেখুন। যদি আসেন, গোবিন্দজীউর মন্দিরে আসবেন।' প্রৌঢ়ের অনাড়ম্বর আমন্ত্রণে বাহুল্য নেই। কিন্তু একটা নিবিড় আন্তরিকতা আছে।

মানুষ চেনা সহজ না। অথচ কতো সহজে মানুষ নিজেকে চিনিয়ে দেয়। মনে বলি, রূপে মজেছি। কোন্ রূপের ফেরে আছি, বুঝতে পারি না। ফিরতে গিয়ে, মনে হয়, মানুষের এই রূপের খোঁজেই আছি। এ রূপ অন্তঃসলিলে বহে। বললাম, 'নিশ্চিন্ত হলাম। কোথাও ঠাঁই না পেলে আপনার কাছেই আসবো।'

'আসবেন।' তিনি চোখ তুলে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, পুবে হাঁটা দিলাম। এক জায়গায় ঘন গাছপালার মধ্যে দেখি দুটি মন্দির। কালের গ্রাসে জীর্ণ। মুখ থুবড়ে পড়ার অপেক্ষায়। মাথার পাঁচ চূড়ার কোনোটাই গোটা নেই। ভিতরে ঝাপসা অন্ধকার। সাবধানে কাছে গিয়ে দেখলাম, ভিতরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। পিছন ফিরে, এগোতে গিয়ে, সামনে এক অসুর মূর্তি। কালো কুচকুচে গাট্টাগোট্টা খালি গা। গোঁফ জোড়া পাকানো। কোমরের কাপড় নেংটির মতো গোটানো। কিন্তু চোখ পাকানো নেই। বরং চোখে মুখে

নিরীহভাব। দৃষ্টিতে অনুসন্ধিৎসা। জিজ্ঞেস করলাম, 'গোলকদাস বাবাজীর আখড়াটা কোথায়?'

'পুবে পাটনি বাড়ির কাছে।' অসুরদেহী প্রায় বালকের স্বরে বললো, 'লদীর ধারে।' হাত তুলে দিক নির্দেশ করলো।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কতো দূরে?'

'দূর কোথায়? ওই তো ওই পুকুরের ধার দিয়ে চলে যান।' সে হাত তুলে দেখালো, 'পাটনি বাড়ির কাছে একটা আম বাগান আছে। বাগানের গায়ে, দোতলা মন্দির। মাথায় লিশেন আছে।'

যাক, মাথার নিশানই নিশানা। এগিয়ে গেলাম। পুকুর পেলাম, যাকে ঘিরে কিছু মাটির ঘর। একটা পাড়া। কিন্তু বাঁড়ুজ্জে মহাশয় গোলকদাসের দোতলা মন্দিরের কথা বলেননি। আম বাগান পেলাম রাস্তার ধারে। গাছের ফাঁকে, নদী দেখা দিল। নিশানও চোখে পড়লো। লাল ঝাণ্ডা বলে ভ্রম হয়। দোতলাই বটে, তবে মাটির বাড়ি। মাথায় খড়ের চাল। অনেকটা জায়গা ঘিরে উঁচু মাটির দেওয়াল। সীমানার মধ্যে, দোতলা ছাড়াও কয়েকটা ঘর রয়েছে। ভিতরে একাধিক খোল আর করতাল বাজছে। তার সঙ্গে ঘুঙুরের শব্দ। এখনও সন্ধে হয়নি। এর মধ্যেই পূজা আরতি শুরু হয়ে গেল নাকি? ঢোকবার দরজাই বা কোন্ দিকে?

ডাইনে বাঁয়ে তাকালাম। বাঁ দিকে ঝাঁটি বাবলার জঙ্গল। ডান দিকে, পাঁচিলের ভিতরে একটা পেয়ারা আর স্বর্ণচাঁপা গাছ মাথা তুলে আছে। সেদিকেই গেলাম। পাঁচিলের পুবে মোড় নিতেই দেখলাম, কয়েকজন গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে দেখি, পাঁচিলের গায়ে দরজা খোলা। আমাকে দেখে সবাই ফিরে তাকালো। ভিতরটা দেখতে পাচ্ছি না। জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কি গোলকদাস বাবাজীর আখড়া?'

'হ্যাঁ।' একজন বললো। বাকিরা কেমন জড়োসড়ো। দরজা ছেড়ে দাঁড়ালো।

সামনেই বাগান। বড় গাছ দুটিই। বাকি সব ফুলের গাছ। বেশি কৃষ্ণচূড়ার ঝাড়। গোটা কয়েক টগর। মাধবী লতার ঝাড় উঠেছে দোতলা ঘরের গা বেয়ে। কাছাকাছি একটা চালকুমড়োর মাচা। অনেকখানি খোলা উঠোন। তিন দিকেই ঘর। দোতলা ঘরের সামনে তুলসী মঞ্চ। একটা ঘরের সামনে উঠোনের ওপর দুটি ছোট মূর্তি অঙ্গভঙ্গি করছে। বোধহয় নাচছে। একজনের মাথায় ময়ূরপুচ্ছের চূড়া। গায়ে পীতবাস। আর একজনের নীল শাড়ি, লাল জামা। মাথার চুল চূড়ো করা। তাতে টগরের মালা জড়ানো। বাজনদারদের দেখতে পাচ্ছি এক পাশে, মাদুরের ওপর। দাওয়ায় কারা বসে আছে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। বাইরে যারা দাঁড়িয়েছিল, তাদেরই জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হচ্ছে?'

'রাধা কিষ্টের যুগল নাচ হচ্ছে।' একজন বললো। কিন্তু নাচের চেয়ে তাদের অবাক জিজ্ঞাসু নজর এখন আমার দিকে।

ভিতরে প্রবেশ কি সমীচীন হবে? না হবারই বা আছে কী। একটা অনুষ্ঠান তো হচ্ছে। উঁচু চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভিতরে গেলাম। বাগান পেরিয়ে, উঠোনে। গোবর মাটি নিকানো তকতকে উঠোন। কৃষ্ণকলি আর মাধবীর মৃদু গন্ধ ছড়াচ্ছে। বেলা পড়ে এলো। এখন কৃষ্ণকলি মাধবীর ফোটার সময়। এবার দাওয়ার মানুষদের দেখতে পেলাম। পুরুষদের মধ্যে প্রধান হয়ে বসে আছেন একজন। মাদুরের ওপর দু পাশে তাঁর তাকিয়া। সমুখে গড়গড়া, তাতে নল। পুষ্ট গৌর অঙ্গটি নধর। গোঁফ দাড়ি কামানো মুখ নিটোল। মাথার ধূসর চুল ঘাড় অবধি লম্বা। মাঝখানে সিঁথি। কপালে রসকলি আঁকা। চোখ দুটি উজ্জ্বল আর তীক্ষ্ণ। মোটা হলেও নাক উঁচু। গলায় তুলসীর মালা। উপবীতও আছে। ঊর্ধ্বাঙ্গ মুক্ত। নিম্নাঙ্গে কচ্ছহীন গেরুয়া বস্ত্র। বয়স অনুমান ষাট। তুলনায় শক্ত পোক্ত। দেখলেই মনে হয়, ভোগী। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। ইনি কি গোলকদাস বাবাজী? তাঁর আশেপাশে বসে আছেন নানা বয়সের, আকৃতি ও বর্ণের বাবাজীরা। সকলের কপালে, গায়ে রসকলি আর নানা ছাপ।

পাশাপাশি আর এক ঘরের দাওয়ায় রমণীগণ। নানা বয়সের। কারোর গেরুয়া লাল পাড় শাড়ি। কারোর বা পাড়হীন। সাদা থানও আছে কারোর অঙ্গে। এমন কি সাধারণ গৃহস্থ সধবা বধূও। সকলেরই মাথায় ঘোমটা। অধিকাংশেরই কপালে রসকলি আঁকা।

এক লহমায় দেখা। কিন্তু ওদিকে বাজনার তালে গোল। নাচে ঠেক। সকলের দৃষ্টি আমার দিকে। আমার দিকে, আবার প্রধান পুরুষের দিকে। তাঁর গড়গড়ার নল থমকানো হাতে। ভ্রূকুটি চোখে অবাক জিজ্ঞাসা। চকিতেই বুঝে নিলাম, আমি এখানে কেবল বেমানান না। মূর্তিমান রসভঙ্গকারী। ঝটিতি খুলে সরিয়ে দিলাম পায়ের স্যাণ্ডেল। সকলের উদ্দেশে কপালে দু হাত ঠেকালাম। প্রধান পুরুষ এক বাবাজীকে ইঙ্গিত করলেন। সে তাড়াতাড়ি উঠে এলো আমার কাছে। চোখে ধন্দ, স্বরে সন্দ, 'কোথা থেকে আসছেন? কিসের খোঁজে?'

নিজের ঠিকানা জানিয়ে বললাম, 'গোলকদাস বাবাজীর দর্শনে এসেছি।'

'ওই যে বসে আছেন।' ঐ প্রধান পুরুষকে দেখিয়ে দিল। 'আসেন।' সমীহ করে হাত দিয়ে পথের ইশারা করলো।

আমি তাকে অনুসরণ করলাম। গোলকদাস বাবাজী নড়ে চড়ে বসলেন। চোখে এখন ভ্রূকুটি নেই। অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা। আমি জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বললাম, 'একজনের কাছে শুনে আমি আপনাকেই দেখতে এসেছি। এখন এই যুগল নাচ দেখি, তারপরে কথা হবে।'

গোলকদাস প্রসন্ন হলেন। গড়গড়ার নলশুদ্ধ হাত তুললেন অভয় ভঙ্গিতে। বললেন, 'বস বাবা।'

বসে পড়লাম। ইঙ্গিত পেতেই, খোল করতালের বাজনা তাল ফিরে পেলো। রাধা কৃষ্ণের পায়ে এলো নাচের ছন্দ। কৃষ্ণের বয়স বছর দশেক। মুখে আর হাতে নীল রঙ মাখা। চোখে কাজল। কপালে গালে চন্দনের কারুকাজ। রাঙানো ঠোঁটে কেন একটা কৃষ্ণকলি ফুল বোধগম্য হলো না। দু' হাতে ধরা মোহন বাঁশি। রাংতা দিয়ে মোড়া, বাঁশির একটা মুখ মকরের না হাতীর, বুঝতে পারছি না। রাধা বোধহয় একটি বালিকা। বয়স সাত আট হবে। তার মুখে হাতে শাদা রঙ। ফুলের সাজই বেশি। একটি কৃষ্ণকলি ফুল তার ঠোঁটেও টেপা। কৃষ্ণ বোধহয় ত্রিভঙ্গ হতে গিয়েই, একবার বাঁ পা ডাইনে, আবার ডান পা বাঁয়ে করছে। করতে করতে ঘুরছে। রাধা পাশে পাশে দু হাত উত্তরীয় উড়িয়ে, একবার ডাইনে হেলছে। আবার বাঁয়ে। দুজনের পায়ের ঘুঙুর বাজছে। এই হলো নাচের ফর্মা।

ছেলেবেলায় দেখা কেষ্টযাত্রার কথা মনে পড়ে যায়। তার থেকে বেশি, অভঙ্গ বঙ্গের ঢাকা শহরের লক্ষ্মীনায়ারণজীউর বিশাল নাটশালার রাধাকৃষ্ণের নাচ। ঠিক প্রায় এমনটিই। তফাৎ, বাদকেরাও সঙ্গে নাচতো। কিন্তু সে-সবের কোনো বিশেষ উপলক্ষ থাকতো! এখানে আজ কিসের উপলক্ষ? বিশেষ এই চৈত্র মাসে? নিশ্চয়ই আছে কিছু। সব কি আর জানি।

তবে আসরের তেমন জমজমাটি ভাবটি নেই। দরজার কাছ থেকে যেমন দেখেছিলাম। বাজনদারদের দৃষ্টি ঘুরে ফিরে আমার দিকে। তাদের কিছু সঙ্গীরও। রমণী পুরুষ দর্শকরাও এই বিঘ্নটিকে মাঝে মাঝে দেখছিল। গোলকদাসের নলে ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ হচ্ছে। সামনে বসে, তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না।

পথ চলতে গিয়ে এই বা মন্দ কী। এসেছিলাম আড়াই শো বছরের পুরনো গ্রাম শ্রীপুর দেখতে। এটি উপুরি পাওনা। কিছুই নিরঙ্কুশ হারায় না। রাঢ়ের গঙ্গার কূলে এক আখড়া। তার উঠোনে দেখছি শৈশবের চিত্র। সেই মনটা নেই। কিন্তু অনেক স্মৃতি, অনেক মুখ ভেসে উঠছে। আর একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের কাছে আটকে থাকছে। নানা স্রোতে বহতা জীবন। তার নানা কূলে নানা নতুনকে পেয়েছি। এখন মনে হচ্ছে, হারিয়েছি বেশি। প্রাপ্যে অনেক ফাঁকি। এমন করে ঘুরে ফেরায়, সেই পুরনো দিনের ঘণ্টা বাজে। মজেছিলাম যে অনেক আগেই। এ চিত্রও সেই এক রূপ। কৌতুকে হেসে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কৌতুকের রঙ্গ দেখতে গিয়ে, মনটা ভারী হয়ে উঠছে।

হঠাৎ খোল করতাল থামলো। আমার পিছন থেকে গোলকদাস স্বর চড়িয়ে বলে উঠলেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজামহ্যম্।'

বাজনদারদের আসন থেকে, এক দাড়ি বাবাজী উঠে দাঁড়ালো, 'যে আমারে যেমনি ভজে আমি তারে তেমনি কৃপা করি।' সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা হলো। তারপরে, 'তাই মদনমোহন শ্রীরাধিকার মান ভাঙাবার জন্যে বিস্তর ব্যাগত্তা করলেন। তখন—।'

খোলে চাটি পড়লো তালে। নাচ তখন বন্ধ। রাধা সরে গেল একটু দূরে। ব্যাগত্তার মানেটা ঠিক বুজলাম না। বোধহয় বিস্তর অনুরোধ উপরোধ। নাটকীয়

মুহূর্ত। বাবাজী কথা ছেড়ে গেয়ে উঠলো, 'তখন মানিনী রাধারাণী মান পাশরিলা/ শ্রীরতিপতি মদনমোহন গলবস্ত্র হৈলা।'

কীর্তনের সুরে গান। কৃষ্ণ গলার উত্তরীয় দু হাতে ধরে জোড় হাত করলো। রাধা ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো। এখন আর কোনো দর্শকের চোখ আমার দিকে নেই। সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রাধাকৃষ্ণ লীলা দেখছে। গায়ক গাইলো, 'তথ্থাপি শ্রীরাধিকা না চাহে নয়নে/এবে কৃষ্ণ পড়িলেন শ্রীমতীর চরণে।'

কৃষ্ণ রাধিকার পায়ে পড়লো। গায়ক গাইল, 'কী কর কী কর নাথ/চরণে না দিও হাত/ তুমি জগতের পতি/ আমার পরম গতি/তোমার চরণে রাখ নাথ।'...

রাধা কৃষ্ণের পায়ে পড়লো। গায়ক গাইলো, 'উলসিত শ্রীহরি অঙ্গে রাধা যাঁচে/ উভয়েতে কোলাকুলি মহানন্দে নাচে।'

খোল করতাল আবার আগের মতো বেজে উঠলো। কৃষ্ণ রাধাকে জড়িয়ে ধরে, জোড়ে নাচ শুরু করলো। এই নাচটা একটু ধেই ধেই ধেইতা নাচনের মতো। পিছন থেকে গোলকদাস আওয়াজ দিলেন, 'রাধে মাধব, রাধে মাধব!'...

রমণী পুরুষ সমবেত স্বরে প্রতিধ্বনি করলো, 'রাধে মাধব, রাধে মাধব।'

কেষ্টযাত্রার ঢঙ। কিঞ্চিৎ অভিনব গোলকদাসের শ্লোক। পালাটি নিশ্চয় অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। এবার গোলকদাসের সঙ্গে সবাই 'হরি হরি বল।'...অনুষ্ঠান শেষ। সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া নামছে। রাধা কৃষ্ণ কোন দিকে গেল, দেখতে পেলাম না। রমণী পুরুষেরা এদিক ওদিক উঠে গেল। একটি আলোর রেখা গায়ে পড়লো। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, ঘর থেকে বেরিয়ে এল এক রমণী। মাথায় ঘোমটা, হাতে প্রদীপ। মুখ দেখা যায়। শ্রীময়ী। শ্রীঅঙ্গে ঢল ঢল, কিন্তু কাঁচা না, যৌবনের লাবণ্য। প্রদীপ নিয়ে দাওয়া থেকে নেমে গেল উঠোনে। তুলসী মঞ্চের কাছে গিয়ে, প্রদীপ রেখে, জানু পেতে নত নমস্কারে যেন সঁপে দিল। বাঁ দিকে শঙ্খধ্বনি। ফিরে দেখি দাওয়ার নিচে নেমে আর এক রমণী শাঁখ বাজায়। তিনবারে শেষ। তুলসী মঞ্চ থেকে রমণী উঠে এলো। ঘরে গিয়ে ঢুকলো। গোলকদাস বিড়বিড় করে কী বললেন, শুনতে পেলাম না। ঘর থেকে সেই রমণীই আবার একটি হ্যারিকেন নিয়ে এলো। আমাদের সামনে রেখে, আবার ঘরে প্রবেশ।

গান বাজনা নাচের পর, হঠাৎই কেমন একটা নিঝুমতা নেমে এলো। গোলকদাস বললেন, 'ফিরে বস বাবাজী। কাছে এসে বস।'

ফিরে বসলাম। হ্যারিকেনের রক্তিম আলোয় গোলকদাসের অঙ্গে বেদানার রঙ। চোখে অনুসন্ধিৎসা। আমি বললাম, 'বড় অসময়ে এসে পড়েছি। আখড়ায় কি আজ কোনো উপলক্ষ ছিল নাকি?'

'যুগল নাচ দেখে বলছ?' গোলকদাস হাসলেন। অটুট দাঁতের পাটি দেখা গেল। ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না বাবা। ওটা সখ আহ্লাদের ব্যাপার। মাঝে মধ্যে ছেলে মেয়েদের সাজিয়ে একটু রাধাকৃষ্ণের নাচ দেখি। অসময়ের কী কথা। তা বল, এবার

তোমার কথা শুনি। কোথা থেকে আসছ? নাম কী? কে তোমাকে আমার কথা বলেছে?' তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো।

নাম ধাম জানিয়ে বললাম, 'ডুমুরদর এক ভদ্রলোক, নাম অম্বিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'নাথ' অবিশ্যি আমি জুড়ে দিলাম। 'চরণ'ও হতে পারে। গোলকদাস বাবাজীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি। চোখে চিন্তার ছায়া। মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করলেন, 'ডুমুরদর অম্বিকানাথ? চেন নাকি নিতাই?'

দাওয়ারই এক পাশে ছায়া অন্ধকার থেকে পুরুষের স্বর শোনা গেল, 'মনে করতে পারছি না গুরুদেব।'

এত মনে করা করির কী আছে? বাঁড়ুজ্জে মহাশয় বলেছিলেন। কথা রাখলাম। আমার বিপত্তারণ বসে আছেন গোবিন্দজীউ স্বয়ং। অবিশ্যি প্রৌঢ় ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে। ঘর থেকে ভেসে এলো রমণী স্বর। স্বরে কিঞ্চিত কৌতুকের সুর, 'গোঁসাই ঠাকুরের মনে নেই। দু' বছর আগে, রাসের সময় সেই একজন এসেছিল না? আখড়ায় দু' দিন ছিল। সেই যে গো—।'

'অই অই।' গোলকদাস হেসে বাজলেন, 'দেখ নিতাই, মনোহরার ঠিক মনে আছে। সেই মাতাল নাস্তিক বামুন। তবে শাস্ত্রজ্ঞান টনটনে। শ্রীমদভাগবত গীতাখানি প্রায় মুখস্থ বলেছিল।'

নিতাই অন্ধকার থেকে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। তুলসী ঠাকুরুণের টিয়ে পাখি যে খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিয়েছিল। কৃষ্ণের জীবকে নাকি খাঁচায় পুরে রাখতে নেই।'

ঘরের মধ্যে দুই তিন রমণীর রিনি ঠিনি হাস্য শোনা গেল। কাছে পিঠেই আছে অনেকে। দেখতে পাচ্ছি না। আমার চোখে, পলকের জন্য ভেসে উঠলো বনশিউলির ঝাড়ে সেই রাগী বুলবুলি মা। প্রকৃতির গভীরে যিনি জীবলীলা দেখেন, খাঁচার পাখির মুক্তি তাঁর হাতেই। গোলকদাস আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন, 'তা বাবা, তুমি আসছ কলকাতা থেকে। ডুমুরদর অম্বিকার সঙ্গে তোমার দেখা হল কোথায়?'

জিজ্ঞাসায় যেন সন্দিগ্ধ অনুসন্ধিৎসা। বললাম, 'ঘুরতে ঘুরতে ডুমুরদয় গেছিলাম, পথে দেখা হয়ে গেল। শ্রীপুরে আসছি জেনে আপনার কথা বললেন।'

'শ্রীপুরে কেন? আমার কাছে?' গোলকদাসের চোখের দৃষ্টি আমার বুকে বিঁধছে। বললাম, 'শ্রীপুরে এসেছিলাম একটু ঘুরে দেখতে। আপনার আখড়াও দেখা হলো।'

'ঘুরে দেখতে? কী ঘুরে দেখতে?' গোলকদাসের স্বরে নিবিড় উৎসুক্য।

ঐখানেই ঠেক। বড় ব্যাজ। বাধা। বললাম, 'যা বলেন। পুরনো গ্রাম, দেব দেউল মন্দির মানুষ, এইসব আর কি।'

'এই সব দেখে বেড়াও।' গোলকদাসের ঔৎসুক্যে, এবার যেন রহস্যের ঝলক।

হাত বাড়িয়ে হ্যারিকেনটা তুলে ধরলেন আমার মুখের সামনে। দেখলেন তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসায়।

এ আবার রাধে মাধবের কী রহস্য? যেন পুলিশের গোয়েন্দার সামনে, চোর দায়ে ধরা পড়েছি। এবার কি আরও জিজ্ঞাসাবাদ? তৎপরে ধোলাই? গোলকদাসের ঠোঁটে হাসি। মাথা ঝাঁকালেন আস্তে আস্তে, 'কিন্তু তুমি তো বাবা মাতাল নাস্তিক নও।'

মাতাল না হতে পারি। নাস্তিক নই, তা কী করে বুঝলেন? জবাবের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এবার দয়া করে হ্যারিকেনটা সরান। গোলকদাস আবার মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হুঁ, বুঝেছি। খুঁজছ, পাচ্ছ না।' সেই অটুট দাঁতের হাসি। হ্যারিকেনটা নামিয়ে রাখলেন।

এবার আমার মস্তিষ্কে ঝংকার। গোলকদাসের চোখের দিকে তাকালাম। তিনি হেসে মাথা ঝাঁকালেন। চোখ বুঝলেন, 'রাধে মাধব। সব তোমার ইচ্ছে।'

মস্তিষ্কের ঝংকারটা লেগেছিল, 'খুঁজছ পাচ্ছ না' কথায়। কিন্তু ওঁর খুঁজে না পাওয়ার নিরিখটা বোধহয় ভিন্ন গোত্রজাত। এ সব কথা ভাবের মানে কোনো দিন বুঝতে পারিনি। রহস্য জানার ব্যগ্রতাও নেই। অতএব, আমারও রাধে মাধব। দু হাত কপালে ঠেকিয়ে বললাম, 'আজ তা হলে উঠি।'

'কোথায়?' গোলকদাসের চোখ জোড়া বড় হলো। কপালে কিলবিল রেখা।

বললাম, 'কোথাও একটা আস্তানা দেখে নেবো।'

'তাই কখনো হয়?' ঘরের ভিতর থেকে রমণী স্বর শোনা গেল, 'এখানে এসে আবার অন্য আস্তানার খোঁজ?'

গোলকদাসের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এক জায়গায় ব্যবস্থা আছে।'

'তা বললে হয় না গোঁসাই ঠাকুর।' রমণী স্বরে আপীলের সুর, 'ডুমুরদর সেই বামুন ঠাকুর পাঠিয়েছে। চলে যেতে দেওয়া যায় না।'

আমার দৃষ্টি গোলকদাসের দিকে। গোলকদাস হাসলেন, 'পাবে পাবে। খোঁজা বৃথা যাবে না। নিতাই।'

'বলেন গুরুদেব।' নিতাই এবার অন্ধকার ছেড়ে আলোয় এলো। মাথায় বড় বড় চুল। মুখে গোঁফ দাড়ি। কচ্ছহীন গেরুয়া কোমরে। গলায় তুলসী মালা, আর উত্তরীয়। সুস্বাস্থ্য, কৃষ্ণকান্ত, নবীন বৈরাগী। গোলকদাস বললেন, 'মনোহরা যা বললে তাই কর। এর হাত মুখ ধোবার ব্যবস্থা দেখ। আমি পূজা আরতিটা সেরে আসি। ভামিনী কি মন্দিরে গেছে গো?'

'গেছে।' ঘরের ভিতর থেকে রমণী স্বরের জবাব।

যে-কোনো হট্ট মন্দিরেই থাকতে রাজি আছি। কিন্তু রাধে মাধব! কী খুঁজছি, কী পাবো? আজ পর্যন্ত নিজে মালুম পেলাম না, আদৌ কিছু খুঁজি কি না। গোলকদাস

সর্বজ্ঞ হয়ে কী প্রাপ্যের বাত দেন? হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধে একটু চাপ দিলেন। দিয়ে গাত্রোত্থান করলেন, 'হাতে মুখে জল দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বস। আরতির সময় মন্দিরে এস।' মাদুরের বাইরে রাখা খড়ম জোড়া পায়ে দিলেন।

দরজায় আবির্ভূত হলো রমণী মূর্তি। চিনতে অসুবিধে হলো না। প্রদীপ হাতে গিয়েছিল তুলসী মঞ্চে। গোলকদাস দাওয়া থেকে নামতে নামতে বললেন, 'মনোহরা, তুমি এখানেই থাক। ব্রজ কোথায়?'

'পুবের ঘরে আছে।' মনোহরা জবাব দিল।

গোলকদাসের আবছা মূর্তি উঠোনে, 'একটু সাবধানে থাকতে বল। রঘু যদি এর মধ্যে আসে, খেদিয়ে দেয় না যেন। বসিয়ে যেন কথা বলে। আখড়ায় হই হল্লা ভাল লাগে না।'

'আমি আছি ঠাকুর ভাববেন না।' মনোহরার স্বরে প্রত্যয়, 'তিলকাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ব্রজর কাছে।'

উঠোনে খড়মের শব্দ পুবের দিকে গেল। ওদিকেই দোতলা ঘর। একতলা ঘরও বোধহয় আছে। এ ঘর দক্ষিণ দ্বারী। পশ্চিমেও ঘর আছে। সেদিকে কোথায় একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। সেই আলোয় দেখতে পাচ্ছি, কারা চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। নিতাই এগিয়ে এসে বললো, 'তা জামাটামা ছাড়েন বাবুজী। পুকুরে যাবেন?'

'তোমার কি মাথা খারাপ বাবাজী?' মনোহরা দরজার বাইরে এসে নিতাইয়ের দিকে তাকালো, 'অচেনা জায়গা, নতুন মানুষ। তাকে নিয়ে পুকুরঘাটে যাবে? বাঁধানো ঘাট থাকলে কথা ছিল। বাতি দেখিয়ে চাতালে নিয়ে যাও।' স্বরে প্রায় আদেশ।

নিতাই বললো, 'ঠিক বলেছ দিদি।'

গোলকদাসের কথাটা মিথ্যা না। শরীরের প্রতি রোমকূপে জলের তৃষ্ণা, তৃষ্ণা গলায় বুকেও। কিন্তু এখানে এখন জামা খুলে খালি গা হতে পারবো না। হাতে পায়ে ঘাড়ে গলায় জল ছোঁয়ালেই শান্তি। কাঁধের ব্যাগটা আগেই নামিয়েছিলাম। মনে নানা প্রশ্ন। বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের কথা মনে পড়ছে, 'সহজিয়া বৈষ্ণব। প্রকৃতি আছে।' এই মনোহরা কি গোলকদাসের প্রকৃতি? কিন্তু রমণীর স্বরে আর রূপে স্বাস্থ্যে একটা শালীনতা আছে। ব্যক্তিত্বও।

'গামছা দেব?' মনোহরা জিজ্ঞেস করলো, 'ধোয়া পরিষ্কার গামছা আছে।'

আমি মনোহরার দিকে তাকালাম। তার লাল পাড় গেরুয়ার ঘোমটা আরও খানিক ওপরে উঠেছে। কালো চুলের মাঝখানে সিঁথিতে সিঁদুর আছে কি না, বুঝতে পারছি না। শরীরের গঠন দোহারাই বলতে হবে। ডাগর চোখজোড়া কি এমনিতেই কালো? নাকি অঞ্জনের টান? কপালে নিখুঁত রসকলি আঁকা। ঠোঁট দুটি নিশ্চয়ই তাম্বুলরঞ্জিত। বয়স? আর নির্ঘাৎ হিসাব তো চোখে মুখে শরীরে লেখা নেই।

পড়তেও জানি কম। যুবতী মনোহরা নিঃসন্দেহে। বললাম, 'সাবান গামছা আমার আছে।'

'তা তো থাকবেই।' মনোহরার ঠোঁটের কোণে সৌজন্যের হাসি, 'ঝোলা খোলার দরকার কী? সাবান অবশ্য দিতে পারব না। গামছা দিতে পারব। পরবার কাপড় দিতে পারব।'

কাপড়ের ঝোলা থেকে গামছা সাবান টেনে বের করলাম, 'থাক। এ ধুতিটা রাত্রে ছেড়ে শোব।'

'মন্দিরে যাবেন কী পরে?' মনোহরার ভুরু জোড়া লতিয়ে উঠলো। চোখে অবাক দৃষ্টি, 'এই কাপড় পরে?'

তাও তো বটে। সেই কোন্ ভোরে বেরিয়েছি। পাট ভাঙা ধুতি এখন দলা মোচড়া ধুলা ধূসর। পবিত্র মন্দিরে পরে পাওয়া যায় না। বললাম, 'পাজামা পরে মন্দিরে যাওয়া যাবে?'

মনোহরা হেসে উঠে, ঠোঁটে হাত চাপা দিল। হাতে রুপোর বালা। প্রবালের রঙের রেখা শাঁখায়। ফিরে তাকালো ঘরের দিকে। সেখান থেকেও হাসি ভেসে এলো। নিতাই আওয়াজ দিয়ে হাসলো, 'পাজামা পরে মন্দিরে যাবেন বাবাজী? ধুতি নেই?'

'থাকলেই পরতে হবে নাকি?' মনোহরার হাসিটা তখনও ঠোঁটে চোখে ঢেউ দিচ্ছে, 'ধোয়া থান দিতে পারি। এরকম শাড়ি চান তো, তাও দিতে পারি।' নিজের আঁচল টেনে দেখালো।

দেখছি রমণী প্রকৃতই প্রকৃতি। সে তো কেবল রূপে না। কথায় আচরণেও। আঁচল দেখাতে গিয়ে অঙ্গের গেরুয়া আবৃত প্রকৃতি উচ্চ শৃঙ্গে প্রকাশ পায়। মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'থান কাপড়ই দেবেন। জামাটাও কি ছাড়তে হবে?'

'কেন থানই গায়ে জড়ালে হবে।' মনোহরার হাসি এখন ঠোঁটে টেপা, 'কিন্তু থান পরবেন?'

'অসুবিধে কিসের?'

'ছেলেমানুষ বয়েস।' মনোহরার কালো চোখে কি নজর বাঁকা?

গামছা সাবান নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, 'ছেলেমানুষ নই, বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেছে।'

'তা হলে তো অনেক বয়স হয়েছে।' মনোহরা আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে দেখলো। এক মুহূর্ত চোখে চোখ রাখলো। প্রকৃতির চোখ, সর্বকালের। হেসে বললো, 'তবে রঙ ধরেনি, এই যা। নিয়ে যাও নিতাই ভাই।'

নিতাই হ্যারিকেনটা হাতে তুলে নিল। মুহূর্তেই আমার বুকে ধড়াস। স্যাণ্ডেল জোড়া যে বাগানের সীমানায় রেখে এসেছিলাম। আছে তো? নতুন কেনা, পথে ঘাটে ঘোরবার জন্য শক্তপোক্ত। বললাম, 'আমার স্যাণ্ডেল রেখে এসেছিলাম ওদিকে।'

'রেখে এলে আছে।' মনোহরা সহজ করে বললো, 'নিতাইয়ের সঙ্গে যান।'

নিতাই আলো নিয়ে দাওয়ার নিচে নামলো। কিন্তু আলো দেখাবার দরকার ছিল না। চাল ঢাকা দাওয়ার বাইরে এসে দেখছি, উঠোনের অর্ধেক জুড়ে জ্যোৎস্নার আলো। আজ শুক্লা অষ্টমী। শহরে বিজলী আলোয়, অষ্টমী কেন, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাকেও চোখে পড়ে না। গ্রামে অষ্টমীর চাঁদ যেন ফুটফুটে জ্যোৎস্না। এখনও পশ্চিমমুখো ঘরের চালের ওপর চাঁদ, দেখা যায় না। দু-তিনটি গাছের লম্বা ছায়া পড়েছে। বন্দী বাতাস এখন মৃদু মন্দে মুক্ত। কৃষ্ণকলি আর মাধবীর ঘন গন্ধ ছড়াচ্ছে। আর এই চৈত্রের জ্যোৎস্না রাত্রিও কুহু কুহু ডাকে আর্ত বিরহী। দেখলাম, যেখানকার স্যাণ্ডেল সেখানেই আছে। মনে মনে লজ্জা পেলাম। কিন্তু গেলে, এই দূরান্তে অসুবিধায় পড়তে হতো। পায়ে গলিয়ে নিলাম। ঘরের দাওয়ার দিকে একবার দেখলাম। মনোহরাকে দেখতে পেলাম না। নিতাই দক্ষিণেই গেল। পাশাপাশি দুই ঘরের মাঝখানে সরু ফালি। সেই ফালি পথে, আরও দক্ষিণে। পিছনে অনেকখানি জায়গা। পুবে দোতলার লাগোয়া একটি ঘর। সামনে দুই মস্ত ধানের মরাই। নিতাই আরও এগোলো। মরাইয়ের পিছনে লম্বা চালায় অল্প ধোঁয়া উঠছে। গন্ধে টের পেলাম গোয়ালঘর। হ্যারিকেনের অল্প আলোয় কয়েকটি গাভী চোখে পড়লো। সম্পন্ন আখড়া। ডান দিকে উঁচু বেড়া। বেড়ার গায়ে উচ্ছের লতা জড়িয়ে উঠেছে। দক্ষিণে মাটির পাঁচিলের গায়ে দরজা। নিতাই বেড়ার আড়ালে নিয়ে গেল।

চমৎকার। চাতাল তো, সত্যই চাতাল। শান বাঁধানো। কুয়োটিও শান বাঁধানো। কপিকলের সঙ্গে দড়ি বালতি রয়েছে, কুয়োর উঁচু চওড়া পাড়ে। কিন্তু জল তোলবার দরকার ছিল না। দুটো বড় বালতি ভরা জল। সামনে পেতলের ঘটি। কুয়োর গায়ে এক ধাপ সিঁড়ি। নিতাই সেখানে হ্যারিকেন রাখলো। 'আপনি হাত মুখ ধোন, আমি বাইরে আছি।'

তার বাইরে যাবার কোনো দরকার ছিল না। আমার আড়াল দরকার নেই। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় হ্যারিকেনটা নিষ্প্রভ। সাবান রাখলাম নিচে। স্যাণ্ডেল খুলে রাখলাম দূরে। গামছাটা এদিক ওদিক করে, রেখে দিলাম কুয়োর পাড়ে। হাঁটুর ওপরে কাপড় গুটিয়ে, জামার হাতা তুলে দিলাম। ঘটিতে জল ভরে, চোখে মুখে দিতেই প্রাণ শীতল। জলটা বেশ ঠাণ্ডা, স্পর্শেই শরীর জুড়িয়ে গেল। হাতে মুখে সাবান দিয়ে, যতোটা সম্ভব ধৌত হলো। মাথায়ও অল্প বিস্তর ছিটিয়ে দিলাম। গামছা টেনে নিয়ে মুছতে মুছতে, বেড়ার—ও পারে রমণী পুরুষের স্বর ভেসে এলো। পুরুষটি নিতাই। রমণী কে? মনোহরা না। অন্য কোনো প্রকৃতি হবে। শুনতে পাচ্ছি, রমণী স্বর, 'পুরুষ মানুষের মতন হলে কথা ছিল। ঘর থেকে বেরব না।' নিতাইয়ের স্বর, 'আহা, সে মানুষ তো খারাপ নয়। তুমি তার ইস্তিরি। সে তো গাঁয়ে গাঁয়ে রটিয়ে বেড়াচ্ছে না, বউ তাকে ছেড়ে গেছে। বলে নাই, নষ্ট হয়ে গেছে।' রমণী স্বর, 'তা হোক, আমি তো আর ঘরে ফিরছিনে।'

এ আবার কী প্রকারের বাক্য বিনিময়? রমণী কি গৃহত্যাগিনী। সেইরকমই ধ্যান দেয় যেন উভয়ের আলাপে। কিন্তু আমার কী দরকার। একটা রাত্রি কাটানো। এক হাতে সাবান গামছা। অন্য হাতে হ্যারিকেন নিয়ে বেড়ার বাইরে এলাম। নিতাই এলো ছুটে, 'আহা, বাবাজী বলবেন তো।'

পুবের হাওয়া থেকে এক রমণী মূর্তি ঘরের মধ্যে চলে গেল। নিতাই আমার হাত থেকে হ্যারিকেন নিল। এবার মহাপ্রাণী গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে। সেই কোন্ বেলায় চিঁড়ে মুড়কি চিবিয়েছিলাম। এখন আর জল ঢাললেও ফুলবে না। চায়ের কথা মনে হতেই, মৌতাতটা খা খা করে উঠলো। অন্ততঃ একটু চা পেলেও শান্তি। কিন্তু আখড়া স্থান। পূজা আরতি আছে। তার আগে কি কিছু জুটবে?

নিতাইয়ের পিছু পিছু ঘরের দাওয়ায় এসে উঠলাম। নিতাইকে জিজ্ঞেস করলাম, 'স্যাণ্ডেল কি নিচে রাখতে হবে?'

'দরকার নেই।' মনোহরা একটা লম্ফ নিয়ে দরজায় এলো, 'দাওয়ার এক পাশে রেখে দিন। ঘরের ভেতরে আসুন।'

মনোহরার ভাষায় পরিচ্ছন্ন বাঁধুনি। আখড়া বোষ্টমীকে যেন মানায় না। সে লম্ফটা এনে দাওয়ায় রাখলো, 'নিত্যই ভাই, হ্যারিকেনটা আমাকে দাও। লম্ফটা গন্ধবাবাজীকে দিয়ে এসো।' হ্যারিকেনটা নিয়ে সে ঘরে ঢুকলো।

গন্ধবাবাজী! এমন নাম কখনও শুনিনি। ঝোলাটা মাদুরের ওপর দেখতে পাচ্ছি না। ঘরের মধ্যে পা দিলাম। ঘর বেশ বড়। ডান দিকে বড় তক্তপোষের ওপর নিটোল শয্যা বিছানা। তার ওপরেই আমার কাপড়ের কাঁধ-ব্যাগ। একটা পাট করা কালো পাড় ধুতিও। আমার ঝোলা থেকে বের করেছে নাকি? মনোহরা হ্যারিকেনটা তুলে, চালের গা থেকে ঝোলানো লোহার আংটায় ঝুলিয়ে দিল। ব্যবস্থা সব পাকা। আমার দিকে ফিরে বললো, 'একটা ধুতির ব্যবস্থা হয়েছে। ওই কুলুঙ্গিতে আয়না চিরুণি আছে। কাপড় বদলান, আমি বাইরে আছি।' মনোহরা দরজার দিকে গেল। আমি না বলে পারলাম না, 'ধুতি তো আমার কাছেও ছিল।'

'না হয় আমার যোগাড় করাটাই পরলেন।' মনোহরা দরজার একটা পাল্লা টেনে, নিজেকে অর্ধেক আড়াল করলো। অর্ধাঙ্গ আলোয়। ঠোঁটের কোণে হাসি, চোখের তারা অচঞ্চল, 'কত ধুতি আর নিয়ে বেরিয়েছেন। নিজেরটা থাক। বরং ধুতি জামা খুলে দিন। আজ রাত্রে কেচে দিলে, সকালের মধ্যে শুকিয়ে যাবে।'

ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'না না, কাচাকাচির দরকার নেই।'

মনোহরা আর একটা পাল্লা টানলো। মুখ ভিতরে। ঘোমটা খসা। চুলে বোধহয় খোঁপা বাঁধা। বললো, 'আগে ছাড়ুন, পরে দেখা যাবে।'

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। শ্রীপুরের ঠেক কোথায় এসে ঠেকলো। সেই প্রৌঢ় ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়লো। এখন আর তা বৃথা। ঘরের

মধ্যে হালকা চন্দনের গন্ধ। ধূপকাঠি জ্বলছে কিনা, বুঝতে পারছি না। জামা গেঞ্জি খুলে ফেললাম। ঝোলা থেকে একটা অয়্যার বের করলাম। মনোহরার দেওয়া ধুতি জড়িয়ে নিলাম। পাঞ্জাবির পকেট থেকে পয়সার ব্যাগ সিগারেট দেশলাই, ছোট নোটবুক আর কলম বের করলাম। তারপরে ছাড়া জামা-কাপড়গুলো কোনোরকমে ভাঁজ করে, পুরে দিলাম ঝোলায়। ধুতি গুছিয়ে পরে, অর্ধেক গায়ে জড়িয়ে নিলাম। নিজের চিরুনি বের করে কুলুঙ্গির কাছে গেলাম। ভিতরে ছোট একটি আয়না। মুখ দেখা যায় অস্পষ্ট। বাতি নেই। মাথা আঁচড়ে নিলাম। সরে এসে দরজা খুললাম।

দরজার একপাশে মনোহরা। পাশে আর এক প্রকৃতি। চোখ মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। দুজনে নিচু স্বরে কিছু বলছিল। দরজা খুলতেই মনোহরা বললো, 'হয়েছে? বাইরে বসবেন, না ঘরে?'

বললাম, 'বাইরেই বসি।'

'তুই তা হলে যা। সেরকম বুঝলে আমাকে ডাকিস।' মনোহরা অন্য রমণীকে বললো। তারপরে আমার দিকে তাকালো, 'ঘরেই বিছানায় একটু আরাম করে বসুন। আমি আসছি।'

বললাম, 'ইয়ে, একটা কথা—।'

মনোহরা যেতে উদ্যত হয়ে ফিরে তাকাল, 'কী?'

সংকোচ কাটাতেই হলো। নেশার মৌতাত তো! বিব্রত হেসে বললাম, 'একটু চা পাওয়া যাবে?'

'দেখি।' মনোহরার ঘাড়ে একটা ঝাঁকুনি লাগলো। চোখে ঠোঁটে হাসির ছটা, 'পাওয়া যাক বা না যাক, মুখচোরা হয়ে থাকবেন না। একটু মুখ খসাবেন।' সে উঠোনের জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

আরাম করতে ইচ্ছা করছে সত্যি। পরিচ্ছন্ন বিছানাটা দেখে লোভও হচ্ছে। কিন্তু সহজ হওয়া সহজ না। একটা সিগারেট ধরিয়ে, তক্তপোষে বসলাম। লক্ষ গেল পুবের দেওয়ালে বন্ধ জানালা। অনুমান, ঐ দিকে গঙ্গা। জানালার খিলটা খুলে ফেললাম। কাঠের গরাদ। সামনে খানিকটা খোলা জায়গা। ঘরের ছায়ায় অন্ধকার। তারপরে ঝোপ জঙ্গল, গাছপালা। ফাঁকে ফাঁকে নদীর দূর স্রোত দেখা যায়। সেই পুবে যেখানে জ্যোৎস্নার কিরণ স্রোতে গলছে। ঝিঁঝির ডাক। রাত্রের গ্রামের স্তব্ধতাকে চমকে দিয়ে মাঝে মাঝেই কুহু আর কুহু।

সম্ভবত আমিই চমকাই। যা নিজবাসে আদৌ শুনতে পাই না। সেই লাল চোখ কালো পাখি এখানে রাত্রেও ডাকে। জ্যোৎস্নার আলো আঁধারি। দূরে নদীর বাঁকা স্রোতে ঝিলিক। মাধবী কৃষ্ণকলির সঙ্গে আরও কিছু বনজ গন্ধ। চৈত্রের উতলা বাতাস। সর্বচরাচরে এক স্বপ্নিল মহিমা। স্থান কাল ভুলে যাই। হারিয়ে যাই এক অজানা কালের গভীরে। অবাক মুগ্ধ প্রাণে কী একটা আবেগ চুঁইয়ে আসে। ভিজিয়ে দেয় মন। ভালো লাগার মহত্ত্বটা বুঝতে পারি, একটা আর্ত অনুভূতির মধ্যে।

টের পাইনি, মনোহরা কখন ঘরে ঢুকেছে। হাতের সিগারেট পুড়ে যাচ্ছিল। গায়ের কাছে সামান্য স্পর্শে ফিরে তাকাই। মনোহরা আমার পাশে দাঁড়িয়ে। মুখ তুলে দেখছে আমার দিকে। ঘোমটা খসা। এলো খোঁপা ভেঙে নেমেছে কাঁধে। চিনতে ভুল করি না। কিন্তু সেই অজানা কালের গভীরে দাঁড়িয়ে কোনো কথা বলতে পারি না। মনোহরার চোখে যেন অবাক অনুসন্ধিৎসা। স্বর প্রায় চুপিচুপি, 'কী হয়েছে বাবাজী?'

মুহূর্তে ফিরে পাই নিজেকে। জানালার কাছ থেকে সরে এসে বলি, 'কিছু না।'

'কিছু তো বটেই।' মনোহরাও হেসে সরে গেল। হাতে তার পেতলের রেকাবি, 'স্বপ্ন দেখছিলেন নাকি? নাকি কারোর জন্য মন কেমন করছে?'

মন কেমন করছে নিঃসন্দেহে। তবে কারোর জন্য না। এ নিজের জন্য নিজের মন কেমন করা। বললাম, 'না। অনেককাল এমন রাত্রি দেখিনি। স্বপ্ন বলতে পারেন।'

'দেখে মনে হল নিশিতে পেয়েছে আপনাকে। কিন্তু এত কষ্ট কিসের বাবাজী?' মনোহরার ঠোঁটে হাসি। চোখে এখনও অনুসন্ধিৎসা।

হেসে বললাম, 'কষ্ট কোথায়?' আনন্দ বলুন।' সরে গিয়ে তক্তপোষে বসলাম।

'তাই হবে হয় তো।' মনোহরার ঠোঁটে টেপা হাসি। চোখে ছটা, 'সব কি আর বুঝতে পারি? এখন একটু খেয়ে নিন।' রেকাবিটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

দেখলাম অপর্যাপ্ত কিছু না। দুটি মালপোয়া। বললাম, 'একটু চা হলেই হতো।'

'পাবেন।' মনোহরার চোখ আমার চোখের ওপর, 'এই খেয়ে একটু জল খেয়ে নিন।'

আমি রেকাবিটা হাতে নিলাম। মনোহরা সরে গেল ঘরের এক কোণে। সেখানে মেটে কলসী ঘাসের বিড়েয় বসানো। এক খণ্ড কাঠের ওপর কয়েকটা মাজা থালা গেলাস। সে গেলাসে জল গড়াচ্ছে। আমি উঠে জ্বলন্ত সিগারেটটা ফেলে দিলাম জানালার বাইরে। মালপোয়া তুলে মুখে দিলাম। খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে ভাজা। মিষ্টি রসে ভেজানো। মুখের রসে আরও ভিজে গেল। মনোহরা জলের গেলাস নিয়ে দাঁড়িয়ে, 'একটা আসন পেতে দেওয়া হল না।'

বললাম, 'গেলাসটা মাটিতে রাখুন না।'

'দাঁড়িয়ে খাচ্ছেন। আমিও দাঁড়াই।' মনোহরার চোখের অনুসন্ধিৎসা আর ঘোচে না।

দুটো মালপোয়া প্রায় দুই গ্রাসেই শেষ। খালি রেকাবি মাটিতে নামিয়ে দিলাম। মনোহরা এগিয়ে এসে জলের গেলাস বাড়িয়ে দিল। বাইরে থেকে রমণী স্বর শোনা গেল, 'চা এনেছি।'

'ভেতরে নিয়ে আয়' মনোহরা ডাকলো। জলের গেলাস তুলে দিল আমার হাতে। ঠাণ্ডা জলের মিষ্টি স্বাদ। সেই কুয়োর জলের স্বাদ। এক চুমুকেই শুষে নিলাম।

ক্ষুধা তৃষ্ণার তৃপ্তি। দেখলাম সাদা জমি সবুজ পাড় শাড়ি পরা এক রমণী। রঙ মাজা, গোল মুখ। নাক বোঁচা, ভাসা চোখ। গলায় তুলসীর মালা, কপালে রসকলি। একেবারে নিরাভরণা। মাথায় ঘোমটা নেই। মনোহরার থেকে বয়স অনেক কম। অনুমান অনধিক বিশ। লজ্জাবনত মুখ, ভঙ্গিতে জড়তা। হাতে চায়ের গেলাস। দেখে মনে হয় কুমারী। তাই কী? না কি কোনো গোঁসাইয়ের প্রকৃতি?

মনোহরা তরুণীর হাত থেকে চায়ের গ্লাস নিল। তরুণী চকিতের জন্য একবার চোখ তুলে দেখলো। মুখ ফিরিয়ে চলে গেল বাইরে। পরিচয় জিজ্ঞেস করা অশালীন। মনোহরাও সেদিকে গেল না। চায়ের গেলাস বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'নিন, বিছানায় বসে চা খান।'

একেবারে দুধেল চা। জলের থেকে দুধ বেশি। তবু চুমুক দিয়ে শান্তি। কারণ দারুচিনি লবঙ্গ আদা মেশানো নেই। তেমনও হয়। চায়ের নামে এক প্রকার গোদুগ্ধের পাচন। মনোহরাও বসলো তক্তপোষের এক ধারে। ওপরে ঝোলানো হ্যারিকেনের আলো তার মুখে বুকে কোলে। ভেঙে পড়া খোঁপাটা আর জড়ায়নি। চিকুর হানা ঝিলিক দিল ঠোঁটে, 'গায়ে কাপড় জড়িয়ে মানিয়েছে ভাল। কপালে রসকলি ছেপে দিলেই হয়। একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

'বলুন।'

'বাবাজীর কী কাজ করা হয়?' মনোহরা ঘাড় কাত করে তাকালো।

এই বড় ব্যাজ। হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারি না। মনোহরার সহজ কথা, 'শুনলাম তখন, ঘুরে বেড়িয়ে গ্রাম দেব দেউল মানুষ দেখা হয়। তবু, কাজ তো কিছু আছে?'

হেসে বললাম, 'ওটা কি কোনো কাজ নয়?'

মনোহরা ঘাড় সোজা করে তাকালো। হেসে বললো, 'বলতে ইচ্ছে না করলে, জোর করব না। মিছে কথা শুনতে ইচ্ছে করে না।' মনোহরার ঠোঁটে চোখে একটু ছায়া ঘনালো। তা হলে সত্যি কথাটাই বলতে হয়। বললাম, 'একটু আধটু লেখালেখি করি।'

'বই?' মনোহরার কালো ডাগর চোখ উজ্জ্বল হলো।

চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে বললাম, 'তাই বলা যায়।'

'তা হলে তো বাবাজী সহজ মানুষ নয়।' মনোহরার চোখের তারা নিবিড়, 'আমাদের জ্ঞানগম্যির বাইরে। তাই বুঝি এই ঘুরে বেড়ানো?'

বললাম, 'না, ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে।'

'পেছু টান নেই?' মনোহরা আবার ঘাড় কাত করলো।

বললাম, 'প্রচণ্ড।'

'সত্যি?' মনোহরা হেসে বাজলো। আর তারই উচ্ছ্বাসে গেরুয়া আঁচল খসলো, 'প্রচণ্ড? দেখে মনে হয় ঘুরে বেড়াতেই মন মজে আছে। এমন কেন?'

বললাম যে, 'ভালো লাগে।'

'উহু।' মনোহরা ঘাড় নাড়লো, 'আরো কিছু আছে। এত দাগা কিসে লাগল?'

ভুরু কুঁচকে বললাম, 'দাগা?'

মনোহরা ঘাড় ঝাঁকালো, 'হ্যাঁ। দাগা খাওয়া মুখ দেখলে চেনা যায়।'

বললাম, 'তাই বুঝি? আমি তো জানি নে।'

'মিছে কথা ভারি খারাপ।' মনোহরা ঘাড় নাড়লো। নিজের বুকে হাত ঠেকিয়ে বললো, 'তোমার ওখানটা জানে। এত ঘুরে বেড়িও না বাবাজী, কোথাও একটু শান্ত হয়ে বস।'

আপনি থেকে ঝপ্ তুমি। এতক্ষণে এই হয়তো তার সহজ সম্বোধন। কিন্তু মনোহরার রূপসী মুখের হাসিতে বিষণ্ণতা। এও প্রকৃতির লীলা? মুখ দেখে সে দাগার দাগ দেখতে পায়। হাসিতে ছায়া পড়ে। তার জীবনের কী অভিজ্ঞতা জানি না। কথা কইতে জানলেই হয়। মানতে হবে, সংসারে তবে দাগা লাগেনি, এমন মানুষ কোথায়? অনাহার অপমান ঈর্ষা প্রত্যাখ্যান, লাঞ্ছনা যতেক, সে যদি দাগা খাওয়া, তবে আমি তাই। তাই চলো মন রূপনগরে। রূপের ফেরে ফিরি। বসে থাকার ঠাঁই খুঁজিনি কোথাও। রূপনগরে সুধা আছে। সন্ধান সেই সায়রে। শান্ত হয়ে বসতে পারিনি কোনোদিন। চোখ তুলে তাকালাম। মনোহরা অপলক চোখে তাকিয়ে। নিঃশ্বাস যেন তার বন্ধ, বুকের কাছে ঠেকে আছে। আমি হেসে মাথা নাড়লাম, 'বসবার সময় নেই, ঠাঁইও নেই।'

'কেন? কী কষ্ট?' মনোহবার স্বরে উদ্বেগ। সে ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে।

বললাম, 'কষ্ট নয়। রূপের টানে ফিরি।'

'রূপের টানে? মনোহরা যেন অস্থির হয়ে উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। স্বর তার রুদ্ধ, 'সেটা বুঝি তোমার কষ্টের উলটো দিক?'

তাকালাম চোখ তুলে। মনোহরার নিঃশ্বাসের উষ্ণ মৃদু স্পর্শ আমার মুখে। চোখের কোণ কি তার চিকচিক করে? এই রমণীর জীবন বৃত্তান্ত কিছুই জানি না। অথচ মনে হয়, কোথায় একটা চেনাচিনি আছে। কী অবিশ্বাস্য। হেসে বললাম, 'আনন্দ পাই।'

মনোহরা ডান হাতে আমার মাথা স্পর্শ করলো, 'তাহলে আর তুমি শান্ত হয়ে বসবে কেমন করে। এত যখন কষ্ট।'

আমি বলি আনন্দের কথা। সে উলটো ভাবে। সত্যি তার চোখের কোণে বিচ্ছু টলটল। আমার চুল টেনে ধরলো আলগোছে। যে চন্দনের গন্ধ পাচ্ছিলাম ঘরে, সেটা এখন মনোহরাকে ঘিরে নিবিড়। প্রকৃতির ঢলঢল লাবণ্য আমাকে স্পর্শ করে। আমারও যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সে সরে গিয়ে, হাত বুলায় চোখে। হেসে বললো, 'তোমাকে প্রথম দেখেই কেমন খটকা লেগেছিল। কথা শুনে আরোই বেশি।

যেই যাবার কথা বললে, তখনই আটকে দিলাম। তুমি নিজেও দাগাবাজ আছ বাবাজী। দাগাবাজেই দাগা খায়। কিন্তু ছেড়ে দিলে কোথায় যেতে বল দিকিনি?'

গোবিন্দজীউর মন্দিরের প্রৌঢ় ব্রাহ্মণের কথা বললাম। মনোহরা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'ভালো জায়গা। কিন্তু কেমন টেনে রাখলাম বলতো? এইবার রূপ দেখ প্রাণভরে।'

মনোহরার লাবণ্যে ঢেউ লাগলো। যেন তুক করার মতোই, বাঁ হাতের কড়ে আঙুল বুকে ছোঁয়ালো। তুলে কাজল টানার মতো চোখে টানলো। 'ধরে রাখলাম, এবার যাও দেখি?'

তাকিয়েছিলাম তার চোখের দিকে। সে খিলখিল করে হেসে উঠে, মুখে হাত চাপা দিল। শরীরের উচ্ছ্বাসে তা চাপা থাকে না। কেবল ভাবি, গতকাল এ সময়ে ছিলাম বিজলী আলোর তলায়। আধুনিকের আসরে। এখন সকল কালের আসর ছাড়িয়ে, এক মহাভাবের অঙ্গনে। সব আধুনিকতার নির্যাস, একলা মনোহরার বচনে। বাস্তববাদীর ঠোঁটের বক্রতাকে দেখতে পাচ্ছি। কোনো দিন গায়ে মাখিনি। মাখলে, নিজেকে দেখতে পাবার এ সুযোগটুকু মিলতো না। বাঁড়ুজ্জে মহাশয় ধরতাইটা দিয়েছিলেন অব্যর্থ।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'এবার আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

'কর।'

'আপনি কে?'

'পতিতা।' মনোহরা হ্যারিকেনের নিচে এসে দাঁড়ালো। মুখে তার ছায়া।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে গিয়ে বুকে আটকালো। নির্বোধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। এও কি প্রকৃতি লীলা? ঠাট্টার একটা সীমা আছে। মনোহরার নিচু স্পষ্ট স্বর, 'মিছে বলিনি। ইস্কুলে পড়েছি, খেলতে খেলতে বড় হয়েছি। একটু দুরন্ত ছিলাম। দেখে বুঝতে পার, দেখতে খারাপ ছিলাম না। ভাল ঘর বর পাবার কথা। একদিন লুট হয়ে গেলাম। চোরাপথে হাতে হাতে ফেরা আর ছিঁড়ে থেঁতলে খাওয়া। উচিত ছিল মরে যাওয়া। অন্ততঃ আত্মঘাতী হওয়া। পারিনি। মফঃস্বলের হাসপাতালে একটা মরা ছেলে বিইয়ে যখন বাড়ি ফিরলাম, সবাই দেখল সাক্ষাৎ পেত্নী। কুলো ঝাড়া দিয়ে, ঝাঁটা পিটিয়ে তাড়িয়ে দিল। দেবে না? এমন পাপ কেউ ঘরে রাখে?'

মনোহরা থামলো। বুকে হাত চেপে যেন জোর করে নিঃশ্বাস নিল। হ্যারিকেনের আলোর নিচের অন্ধকারে তার মুখ আবছা। চৈত্রের জ্যোৎস্না মাখা উতলা রজনী এ ঘরে এখন রুদ্ধশ্বাস। প্রসন্ন হাসি উচ্ছ্বাসের মুখে ঝাপটা দিয়ে নেমে এলো পাথর চাপা স্তব্ধতা। আমি নিজেও যেন নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি না। বুঝতে পারিনি, একটা জিজ্ঞাসা কোন্ কপাটের খিল খুলে দিচ্ছে।

মনোহরা একটু হাসলো বোধহয়, 'মনে আছে, দেশ তখন সবে স্বাধীন হয়েছে।

তাই নিয়ে দেশ মত্ত। কিন্তু আমার মত ঘটনা কি ঘটছিল না? চিরকালই তো ঘটে আসছে। এক অনাথ আশ্রমে ঠাঁই পেয়েছিলাম। থাকতে পারিনি। কিন্তু কী হবে এত অনাচারের কথা বলে? তবে পতিতা এক কথা। পতিতাবৃত্তি আর এক কথা, তাই নয়? পুরুষও কত ভাবে পতিত হয়, সেই অর্থে আমি পতিতা ছিলাম। আমাকে উদ্ধার করেছিলেন কৃষ্ণদাস গোস্বামী, এই আখড়া যাঁর হাতে গড়া। মারা গেছেন। তিনি আমাকে ঠাকুরের পায়ে রেখে দিলেন। যেমন করে শেষ নিদানের আশায় মরার আগে গরীব মানুষ ঠাকুরের থানে ফেলে রাখে। বেঁচে গেলাম।'

ঘরে একটা দমকা বাতাস এলো। হ্যারিকেনটা দুলে উঠলো। সলতেটা কেঁপে কেঁপে উঠলো। মনোহরার চোখের কোণে জলের বিন্দু টলটলে। মুখে হাসি। ইচ্ছা করলো, উঠে গিয়ে এখন আমি তার মাথায় হাত দিই। কিন্তু সেটা পারবো না। তার জীবনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা অনেক রয়ে গেল। বলা ভালো, নতুন করে জাগলো। কিন্তু আর তা করতে পারি না। বললাম, 'না জেনে এখন একটা কথা জিজ্ঞেস করে ফেললাম। আপনাকে কিন্তু কষ্ট দিতে চাইনি।'

'কষ্ট?' মনোহরা এগিয়ে এলো দু'পা, 'আনন্দ বল। মরে বাঁচার আনন্দ নেই? নিজেকে পবিত্র ভাবতে পারার মত শক্তি আর কী আছে? কৃষ্ণদাস গোস্বামীর কাছেই জেনেছি, যে শরীরে কলঙ্ক, সেই শরীরেই পুণ্য। এই শরীর মহাভব, এই শরীরেই মহাভাব। তিনি সহজভাবের সাধক ছিলেন, আমাকে সেই দীক্ষা দিয়েছিলেন। সহজ সাধনাই সব থেকে কঠিন সাধনা। আবার অনাচারের ভয়টাও বেশি। কিন্তু সে সব কথা তোমাকে বলবার নয়। তবে তোমাতে আমার মন একটু মজেছে, তাই তোমাকে একটা কথা বলতে পারি।' মনোহরার চোখের তারায়, ঠোঁটের কোণে ঝিলিক দিল।

তার সহজ সাধনার ইঙ্গিতটা জানি। এই শরীর মহাভব, এই শরীরেই মহাভাব, এ বৃত্তান্ত জেনেছি অনেক আগে। সাধক হয়ে না। সাধকের সান্নিধ্যে গিয়ে। দেহতত্ত্ব সেখানেও। ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড এক। শরীর ব্রহ্ম অভেদ। এক সাধিকা তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন, 'আমি ভাণ্ড। আমি ব্রহ্মাণ্ড।' মনোহরা কী বলবে? আমাতে তার মন মজেছে, সেটা হয় তো যথার্থ অর্থে প্রীতি। অন্যথায় এত কথা বলতো না। আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

'কৃষ্ণদাস গোস্বামী সেই প্রথম দিন আমাকে যাঁর পায়ে সঁপে দিয়েছিলেন, আমি তাঁর প্রকৃতি। বুঝলে কিছু?' মনোহরা ঘাড় কাত করে তাকালো।

যদি বা একটা অস্পষ্ট সংকেত পাচ্ছি. মুখ ফুটে তা বলতে পারছি না। তাই ঘাড় নাড়লাম। মনোহরার চোখের তারা নিবিড় হলো, 'সহজ তত্ত্ব হলো পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্ব। আমার একজন পুরুষ চাই না? চাই। গোস্বামী যাঁর পায়ে রেখেছিলেন, বলেছিলেন, তোমাকে এত মারলেন তিনি, বাঁচাবার দায় তো তাঁরই। তিনি সেই পরমপুরুষ। আমি তাঁর প্রকৃতি।' মনোহরার চোখের তারা দুটি প্রতিমার মতো দীপ্ত

উজ্জ্বল দেখালো। নিজের উদ্ভিন্ন বুকে আঙুল ছুঁইয়ে এমন করে এক পা এগিয়ে দিল, যেন সে এই মুহূর্তে সাক্ষাৎ প্রতিমা।

এই তবে তার প্রকৃতি লীলা? এই তার দেহতত্ত্ব! আমার পুরনো অভিজ্ঞতায় মিললো না। প্রবৃত্তির পিশাচ খড়্গ তাকে ছিন্নভিন্ন করেছে। সেই কারণেই কি তার এই প্রকৃতি লীলা? সেই কারণেই কি এত অনায়াসে সহজ হয়ে উঠতে পারে। হাসির উচ্ছ্বাসে ব্যক্তিত্ব অটুট থাকে? গোলকদাস বাবাজীকেও তাই মান্য করতে হয় তাকে। সেই কারণেই কি তার আদেশ এত স্পষ্ট। এ কি আত্মনিগ্রহ? তাই যদি, তবে তার মানবী রূপ এমন হাসি উৎফুল্ল রমণীয়তা পেল কোথা থেকে?

'কী ভাবছ বাবাজী?' মনোহরা এগিয়ে এলো কাছে।

বললাম, 'ভেবে তো সব কিছুর হদিশ মেলে না। কিছু বিষয় তো চিরদিন ভাবনার মধ্যেই থাকে। বলার কিছু নেই। আমি সাধারণ মানুষ। সহজেই মজে যাই। আপনাকে দেখে তাই অবাক লাগে।'

'ধোঁকাবাজ।' মনোহরা আমার গায়ে জড়ানো ধুতি বুকের কাছে চেপে ধরলো, 'বড় সাধারণ, তাই সহজে মজে যাও। এইটুকু সময়ের মধ্যে তোমার মজে যাওয়া তো দেখলাম। ওই জানালা থেকে যখন মুখ ফেরালে, তখন তোমার সেই মজা মুখ দেখেছি। নইলে এমন করে তোমাকে খামচে ধরতে পারতাম না।' আমার বুকের কাপড় ধরে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিল, 'বুঝেছ? অবাক কিসের? তোমাকে কোলে বসিয়ে খাওয়াতে পারি। চল, পুজো শেষ হয়ে এল, আরতি দেখবে।'

পা বাড়াবার আগে, আবার মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?'

'আবার?' মনোহরা চোখ বড় করে তাকালো।

বললাম, 'তবে থাক।'

'না, শুনি। কিছু চাপা থাকা ভাল নয়।'

বললাম, 'গোলকদাস বাবাজীর ঐ কথাটার অর্থ কী? খুঁজছ, পাচ্ছো না। পাবে পাবে।'

'তোমাকে দেখে কিছু একটা মনে হয়েছে।' মনোহরা হাসলো, 'নিজেই বলবেন। তবে মনে হয়, আমার সেই কথাটাই বলবেন। বাবাজী, একটু শান্ত হয়ে বস। কিন্তু তোমার কপালে যে বসবার ঠাঁই নেই, সে-কথাটা উনি বুঝবেন কিনা জানিনে। চল।'

মনোহরা ঘর থেকে বেরোবার আগে উঁচুতে হাত বাড়িয়ে হ্যারিকেনের সলতে একটু নামিয়ে দিল। আমি একটু ঠেক খেলাম। আমার সাধারণত্ব আমাকে চেপে ধরে। তক্তাপোষের বিছানায় আমার পয়সার ব্যাগ পড়ে রইলো। মনোহরা পা বাড়িয়ে ফিরে তাকালো, 'কী হলো?'

বললাম, 'এসব কি খোলা পড়ে থাকবে?'

'থাকবে। শেকলটা তুলে দিয়ে যাব, তা হলেই যথেষ্ট।' মনোহরা যেন নতুন করে আত্মপ্রকাশ করলো, 'এটা আমার আখড়া। এস।'

আমার ভিতরে কোথায় কুঁকড়ে গেল। বিব্রত হাসলাম। বললাম, 'আসলে আমি এই।'

'যে মানুষ সজাগ নয়, তাকে ন্যালা খ্যাবলা বলে। সে কোন কম্মের নয়।' মনোহরা হেসে বাইরে পা দিল। তার সঙ্গে বাইরে গেলাম। এখন সারা উঠোন বাগান জুড়ে জ্যোৎস্না। ফুলের গন্ধ নিবিড়। কালা পাখি কি থামবে না? পুবের ঘরে একটা টিমটিমে প্রদীপ জলছে এক পাশে। ঘরের এক পাশ দিয়ে ওপরে ওঠার মাটির সিঁড়ি। আমার কাছে নতুন না। বীরভূমের মলুটি গ্রামে প্রথম মাটির দোতলা ঘরে উঠেছিলাম। মনোহরা সিঁড়িতে পা দিয়ে, আমার একটা হাত টেনে ধরলো। বললাম, 'উঠতে পারবো।'

'অভ্যাস আছে, মাটির সিঁড়ি ওঠা?'

'আছে।'

'অনেক কিছুই আছে দেখছি।' মনোহরা তবু হাত ছাড়লো না।

ওপরের ঘরে ঘণ্টা কাঁসর বেজে উঠলো। ঘরে উঠে দেখি, পাঁচ ছ'জন বাবাজী রয়েছে। তিন বৈষ্ণবী। বয়স্কা একজন। বাকি দু'জনের একজন তিলকা। আর একজন অচেনা। এই বোধহয় ভামিনী। মনোহরার সমবয়সী হতে পারে। অথবা কিঞ্চিৎ বেশি। শ্যাম অঙ্গে উজ্জ্বল কিরণ। টিকলো নাক, টানা চোখ। জামা শাড়ি মনোহরার মতো। মাথায় ঘোমটা। মাথায় এখন মনোহরার ঘোমটা টানা। তার সঙ্গে ভামিনীর দৃষ্টি বিনিময় হলো। চোখে চোখে হাসি।

নিকোনো মেঝে। কাঠের সিংহাসনে গৌর নিতাইয়ের মৃন্ময় মূর্তি। আর এক সিংহাসনে রাধা কৃষ্ণ। দুই সিংহাসনের মাঝখানে ছোট মাপের একটি ফটো। ফ্রেমে বাঁধানো। পরে জেনেছি ঐটি কৃষ্ণদাস গোস্বামীর ফটো। গোলকদাস বাবাজীর বাঁ হাতে ঘণ্টা। ডান হাতে চামর ঘুরিয়ে আরতি করছেন। নিতাই কাঁসর বাজাচ্ছে। মনোহরা আমাকে আঙুলের নির্দেশে জায়গা দেখিয়ে দিল। আমি এগিয়ে গিয়ে বসলাম। গোলকদাস বাবাজী একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলেন।

আরতি চললো বেশ খানিকক্ষণ। শুধু চামর না। গেরুয়া উত্তরীয়, দর্পণ, ধূপ, কর্পূরের দীপ। পঞ্চপ্রদীপের আরতি শেষে, সেটি তুলে দিলেন ভামিনীর হাতে। ভামিনী প্রদীপ নিয়ে আগে এলো আমার কাছে। হাত বাড়িয়ে উত্তাপ নিয়ে মাথায় বুকে দিলাম। যেখানে যা নিয়ম। ভামিনী সকলের কাছে গেল। গোলকদাস তখন চোখ বুজে স্থির হয়ে বসে। বোধহয় জপ করছেন। সামনে কয়েকটি পাথরের পাত্রে ফুল ফল বাতাসা মণ্ডা। একটিতে খিচুড়ি আর সামান্য ব্যঞ্জন।

গোলকদাস উপুড় হয়ে প্রণাম করলেন। সেই সঙ্গে সকলে। কেবল আমিই চুপচাপ বসে। গোলকদাস বসে উচ্চারণ করলেন, 'রাধেমাধব।'

সকলে প্রতিধ্বনি করলো। গোলকদাস আমার দিকে ফিরে হাসলেন, 'বেশ দেখাচ্ছে।'

'কপালে একটা রসকলি এঁকে দেব ভাবছিলাম।' মনোহরা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

গোলকদাস বললেন, 'দিলে না কেন? মানাত ভাল।'

ভামিনী আমার হাতে প্রসাদ বাড়িয়ে দিল। শশা কলা বাতাসা মণ্ডা। তারপরে পাত্র তুলে দিল তিলকার হাতে। বাবাজীরা একে একে সব নেমে গেল। তিলকাও গেল সঙ্গে এবং বয়স্কা বৈষ্ণবী। গোলকদাস আমার মুখোমুখি বসলেন। ভামিনী আর মনোহরা পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলো। মনোহরা উঠে দাঁড়ালো। আমি তার দিকে তাকালাম। সে একটু মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো। ইশারায় গোলকদাসকে দেখালো। ভামিনী তুলে নিল খিচুড়ি ভোগের পাত্রটি।

'বাবাজীর থাকবার কী ব্যবস্থা করেছ মনোহরা?' গোলকদাস জিজ্ঞেস করলেন।

মনোহরা বললো, 'দক্ষিণের পুব কোণের ঘরে। নিতাই সঙ্গে থাকবে।'

'ভাল।' গোলকদাস বললেন, 'আমি এর সঙ্গে একটু আলাপ করি।'

মনোহরা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'করুন।' সে আর ভামিনী নিচে নেমে গেল।

মনোহরা কিছু ভুল বলেনি। গোলকদাসের কথার মধ্যে, একটু শান্ত হয়ে বসার কথাটাই অন্যভাবে এসেছিল। আমি যে ঈশ্বরের সন্ধানে আছি, সে-বিষয়ে তাঁর সন্দেহ নেই। মনোহরার সঙ্গে গোঁসাই ঠাকুরের কী আশ্চর্য তফাৎ। ঘুরে ঘুরে সন্ধান হয় না। ছটফটিয়ে ঘুরে ফল নেই। শিকড় গাড়ো, সঁপে দিয়ে থাকো। এমন কি, আভাসে এমন কথাও জানিয়ে দিযেছেন, প্রকৃত গুরুর সন্ধান দরকার। গুরু কেন? গুরু কাণ্ডারী, এ ভব তরীর। সেই সঙ্গেই সহজিয়া বৈষ্ণব তত্ত্বের সঙ্গে গুরুর যোগটা কোথায়, সে তত্ত্বটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। অবিশ্যি কিছু কিঞ্চিৎ সহজিয়া তত্ত্বের বাখানিও।

হিন্দু তন্ত্র আর বাউলের দেহতত্ত্বের সঙ্গে ইতর বিশেষ কিছু নেই। প্রকৃত বাউলের কোনো ঈশ্বরের আকার আকৃতি রূপ নেই। হিন্দু তন্ত্রে আছে। বৈষ্ণবের আছে রাধাকৃষ্ণ, গৌর নিতাই। গোলকদাস বাবাজীর মনে বোধহয় কিঞ্চিৎ সন্দেহ ছিল, পাছে তাঁকে আমি বুঝতে ভুল করি। সেজন্যই তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের 'বৈধী' ভাবের ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু 'রাগানুগা' ভক্তির সঙ্গে তাঁর প্রভেদ আছে। রাগানুগা ভক্তি হলো 'রাগের ভজন।' তাকে বলে প্রেম পীরিতি সাধন। একে তুমি বেদে পাবে না। শাস্ত্র ঘেঁটে পাবে না। এর জন্য গুরু চাই। পরম গুরু হলেন গৌর নিতাই। তাঁদের কাছ থেকে যাঁরা তত্ত্ব জেনেছেন, গুরু পরম্পরায় তাঁরাই নানা রূপে নানা খানে বসত করছেন। তোমাকে খুঁজে নিতে হবে। খুঁজছ যখন, পাবে। 'পাবে' বলে গোলকদাস তাঁর উজ্জ্বল

চোখ দুটি ভুরুর মাঝখানে এনে, আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিলেন। ঠোঁটে ছিল রহস্যের হাসি।

কারণ কী? কেমন যেন মনে হয়েছিল, চেয়ে দেখ স্বয়ং গুরু তোমার সামনে বসে। ছোট আমার মন। হয় তো ভুল বুঝেছি। কিন্তু মনটা সহজ হতে পারেনি। সরস হয়ে ওঠেনি। তিনি গুরুতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন অনেক ভাবে। দু কলি গান গেয়েও শুনিয়েছিলেন, 'আমার যায় না দুখের দিন/হয় না সুদিন/আমি কী রূপে পাব শ্রীগুরুর চরণ।' চোখের তারা নিবিড় করে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন, 'গুরু তোমার কাছে পিঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি দেখেও তাকে চিনতে পারছ না। কানা চোখে পাগলের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছ। আমি তোমার চোখ দেখে বুঝেছি বাবাজী, জ্বলে পুড়ে মরছ, তাঁর নাগাল পাচ্ছ না। একটু থিতু হয়ে বসে, ধ্যান দিয়ে নজর কর পাবে।' আমার ঘাড়ে হাত রেখে, ঝুঁকে পড়েছিলেন। ফিসফিস করে বলেছিলেন, 'গুরু রূপে নয়ন দে রে মন।'

কথাটা শুনেই আমার কানে বেজে উঠেছিল কেঁদুলির বাউলের গান। যে সে বাউল নন, নাম তাঁর নবনীদাস, বৃদ্ধ। রবিঠাকুর তাঁর গান শুনতে ভালবাসতেন। বাউল অনেক দেখেছি। গান শুনেছি। নবনীদাসের গানের বচন, চোখ মুখের ভঙ্গি, ঠারে ঠোরে নানা ইশারা সংকেত, এমন আর কারোর দেখিনি। শুনিনি। এখন সেই গানের কলি শুনছি, গোলকদাসের মুখে। সহজিয়া বৈষ্ণবের গুরুতত্ত্বে, বাউল তত্ত্বের তফাত কোথাও নেই। কিন্তু গোলকদাস আমাকে যেমন করে গুরু চিনতে শেখাচ্ছিলেন, শুনে আমার মন বঁড়শীর দূরে। জপেও নেই, টোপেও নেই। তবে কথা একটিও বলিনি। শ্রোতা আমি ভালো। নির্বিকারে শুনি। কানে বাজে ভিন্ সুর। বলতে পারি না, অই মহাশয়, আমি রূপের ফেরে ফিরি। আমার রূপনগরের রূপ ভিন্ন। সেখানে আপনিও এক রূপ।

অতএব, গোলকদাস নিজরূপে দর্শনধারী। কারে কয় দীক্ষাগুরু, কে বা শিক্ষাগুরু বেবাক ব্যাখ্যা করেছিলেন। একেবারে শেষে, গুরু কল্পতরু। সে রাগের আশ্রয়। ঘুরে ফিরে সেই তন্ত্রের সংকেত। তন্ত্রে যিনি শক্তি, সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনে সে রাগাত্মিকা। অর্থাৎ প্রকৃতি। বাউলের ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। সেও পুরুষ প্রকৃতি। কারণ, দেহতত্ত্বে এক নেই। প্রকৃতি পুরুষরূপে জোড়া। সেটুকুই বা তিনি ব্যাখ্যা করতে ছাড়বেন কেন? কৃষ্ণ আপনিই পূর্ণ। রসের আস্বাদনের জন্য অন্য অঙ্গে ভিন্ন। তার নাম রাধা। দুজনের একই আকার। কিন্তু নারী পুরুষ রূপে সতত বিহার করেন। তবে, এর সঙ্গে যোগ সাধনা চাই। কেন? না, কাম ছাড়া গতি নেই। আবার কামকেই প্রেমে রূপান্তরিত করতে হবে। এ সাধনা কঠিন সাধনা।

অথচ এই কথাগুলোই মনোহরা কতো সহজে বলেছিল। গোলকদাসকে আমার পুরনো অভিজ্ঞতার কথা বলিনি। বলার কোনো কারণ ছিল না। নানা কথার হেরফেরে, সেই নাভিমূল, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার স্থান নির্ণয়। বৈষ্ণব সহজিয়ার ব্যাখ্যাটা এইরকম।

মূলাধারে চতুর্দল স্বাধিষ্ঠানে ষড়দল। এই দশমদলে কুলকুণ্ডলিনী বিরাজ করছেন। কাম ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম কৃষ্ণ। আর সেই রসবতী যুবতীই ধন্য, যার কৃপাতে কৃষ্ণ উপলব্ধি হয়।

হাতে ঘড়ি ছিল না। সময় ঠাহর করতে পারিনি। বাইরে সেই কুহু কুহু। পুবের জানালা দিয়ে চৈত্রের বাতাস আসছিল। ফুলের গন্ধ সেই বাতাসে। তার সঙ্গে আর এক গন্ধ, একেবারে মহাপ্রাণীর মূলে গিয়ে বিঁধছিল। সুগন্ধ আতপ চালের সঙ্গে ভাজা মুগের ডালের খিচুড়ির গন্ধ। রূপনগর তো কেবল রূপে থাকে না। রসে গন্ধেও আছে। আছে বাতাসে শব্দে। জ্যোৎস্নার মায়ালোকে।

একসময়ে ভামিনীর আবির্ভাব হয়েছিল, 'গোঁসাই কি তামাক খাবেন?'

'অ্যাঁ?' গোলকদাস হাই তুলে তিনবার তুড়ি দিয়েছিলেন, 'রাধে মাধব। হ্যাঁ ভামিনী, চল নিচে যাই। বাবাজীর সঙ্গে একটু আলাপ করলাম। চল বাবাজী, নিচে গিয়ে বসি।'

আত্মারামের বড় সুখ। কখনও কখনও সে একরকমের খাঁচা ছাড়া হতে চায়। সে খাঁচাটা শরীরের খাঁচা না। ব্যাধের ফাঁদ। নিচে গিয়েছিলাম। তখনই লক্ষ করেছিলাম, সিঁড়ির মুখে দরজা। নিচের ঘরে মাদুরের ওপর তাকিয়া। সামনে গড়গড়া। ভামিনী আমাকে বলেছিল, 'আপনি দক্ষিণের ঘরে যান।'

'এখানেই বসলে হত।' গোলকদাস আবার ফাঁদ পাতছিলেন।

ভামিনী বলেছিল, 'সেই কোথা থেকে, সারাদিন রোদে তেতে পুড়ে এসেছে। বাবাজী তো সহজে ছাড়া পাচ্ছে না, নিয়ে বসবার অনেক সময় পাবেন।'

সে আবার কী? ফাঁদের বহর কতো বড়? কয় দরজা, ক'জন দ্বারী বুঝতে পারি না। সহজে ছাড়া পাচ্ছি না মানে কী? গোলকদাস অগত্যা আমাকে রেহাই দিয়েছিলেন। ভামিনী আমাকে উঠোন পেরিয়ে দক্ষিণের ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল। শূন্য ঘর। হ্যারিকেনের সলতেটা বাড়ানো। তক্তাপোষের বিছানায় বালিশ পাতা হয়ে গিয়েছিল। পাশেই রাখা ছিল আমার পয়সার ব্যাগ, সিগারেট দেশলাই, চোখের কালো ঠুলি, নোটবই কলম। কাঁধ ঝোলাটা পুব দিকে রাখা একটা কাঠের সিন্দুকের ওপরে। আগেই একটা সিগারেট ধরিয়েছিলাম। মনোহরা এসে দাঁড়িয়েছিল। তাকে কেমন একটু অগোছালো দেখাচ্ছিল। আঁচল দিয়ে মুখ আর গালের ঘাম মুছেছিল। তারপরে প্রথম বাত, 'ঝোলা থেকে ময়লা জামা কাপড়গুলো কাচতে দিয়ে দিয়েছি।'

আমি ত্রস্ত হয়ে বলেছিলাম, 'কেন? সকালে যদি না শুকোয়?'

'তা হলে দুপুরে শুকোবে।' মনোহরা তক্তাপোষের এক ধারে বসেছিল। ঘাড় কাত করে তাকিয়েছিল। কালো তারা চোখের কোণে, 'রূপের টানে যে ফেরে, তার এত তাড়া কিসের?'

বলেছিলাম, 'যাব অনেকখানে।'

'সেই অনেকখানের এই একটা খান।' মনোহরা ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসেছিল, 'ডেকে আনতে যাইনি। নিজে এসেছ। আসাটা নিজের, যাওয়াটা অন্যের হাতে। এটা বোঝ না?'

বলেছিলাম, 'কিন্তু—।'

'চলে যেতে চাও?' মনোহরা আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিল, 'তুমি রূপের টানে ফের। দুঃখীকে দুঃখী চিনতে পারে না? তোমার রূপের ঘরে কী আছে। আমি নেই?' সে তার বুকে হাত রেখেছিল।

আমি হঠাৎ কোনো কথা বলতে পারিনি। তাকিয়েছিলাম তার চোখের দিকে। তার গোটা জীবনটা যেন চকিতেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম, মনোহরা আমার অচেনা না। জীবনের সেও প্রথম দেখা। বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের মতোই। কিন্তু কোথায় যেন একটা চেনাচিনি হয়ে গিয়েছিল। সেই চেনাটা, হাসির আড়ালে ব্যথিতের বন্ধুত্ব। কথা বলতে পারিনি। একটা আবেগ বোধ করেছিলাম। মনোহরার কালো চাখের দীঘিতে একটা কিরণ ছড়িয়ে পড়েছিল। নিঃশ্বাস পড়েছিল। বলেছিল, 'মন সাফ?'

আমি ঘাড় কাত করেছিলাম। মনোহরা ডান হাতের তিন আঙুল তুলে দেখিয়েছিল, 'তোমাকে তিনে বাঁধলাম।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কী?'

'ত্রি'। মনোহরা আঙুল নামায়নি, 'ত্রি'-তেই অনেক। ধরা আর ছাড়া। ত্রিকাল, ত্রিগুণ, ত্রিবেণী, ত্রিকূল, ত্রিগুণাত্মিকা, ত্রিবেদী, ত্রিভঙ্গ, ত্রিভুবন, ত্রিশুল, ত্রিরাত্রি। তোমার তিনরাত্রি আমার। লুট পড়েছে, লুটের বাহার লুটে নেরে তোরা। তোমাকে লুট করলাম। বুঝলে?'

এমনই অনায়াস বোধ করেছিলাম, হেসে বলেছিলাম, 'একটু একটু।'

'সত্যি?' মনোহরা উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত ছড়িয়ে দিয়েছিল, 'রূপখোর, দেখ এই আমি সেই প্রকৃতি। চিনতে পার?'

মনে পড়েছিল তার একটি কথা। 'তোমাকে কোলে করে খাওয়াতে পারি।' তাকে চিনতে তো ভুল হবার কথা না। আবার বলেছিলাম, 'একটু একটু।'

'আবার একটু একটু?' মনোহরা হাত তুলেছিল মারের ভঙ্গিতে। মারতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হাসির মুখে হাত চাপা, 'না মারব না। অনেক মার খেয়েছ, খাবে আরো। মারের গায়ে যদি মলম চাও, তা হলে যখন খুশি এস। এমন একটা ক্ষত দেবে?'

এ কথাটার জবাব দিতে পারিনি। মনোহরা আবার উচ্ছ্বসিত হাসির মুখে হাত চেপেছিল। তারপরে আমার কাছে শুনেছিল গোলকদাসের আলাপ বৃত্তান্ত।

মনোহরা একটি মন্তব্য করেছিল, 'তুমি যে রূপে গুরু ধরে আছ, গোঁসাই সেটা জানেন না।'

আমি মনোহরাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ভামিনী কে?'

'গোলকদাস গোঁসাইজীর প্রকৃতি।' মনোহরা জবাব দিয়েছিল, তার সঙ্গে নিবিড় চোখে তাকিয়ে পাল্‌টা জিজ্ঞাসা, 'তুমি সহজিয়া বৈষ্ণবদের প্রকৃতি বিষয় কিছু জান?'

মনোহরাকে বলতে বাধা ছিল না, 'আমি তন্ত্রসাধক আর বাউল সাধকদের সঙ্গে অল্পবিস্তর মেশবার সুযোগ পেয়েছি। বাউলদের প্রকৃতি করণ কারণ কিছু জানি।'

'তবে তো আর কিছু জানবার নেই।' মনোহরা বলেছিল, 'কিন্তু কতটা জান?'

সেখানে কিঞ্চিৎ ঠেক। কোনো রমণীর সঙ্গে সে-বিষয়ে কখনও কথা বলিনি। জবাব দিয়েছিলাম, 'আমার তো সব কথা জানবার নয়। শুনেছি, গুপ্ত সাধনতত্ত্ব অসাধকের জানার নয়।'

'তবে যে বললে, সাধকদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছ?' মনোহরা ঘাড় কাত করে চোখে চোখ রেখেছিল। যেন বন্ধন করেছিল।

আমি বলেছিলাম, 'চণ্ডীদাসের একটা পদ মনে পড়ছে।'

'বল শুনি।'

'প্রকৃতি হইয়া পুরুষ আচার করিবে নারীর সঙ্গ।'

'এটা তো একটা সাধারণ কথা। আর কিছু?'

বিপদগ্রস্ত বোধ করেছিলাম। বলেছিলাম, 'একটা বাউল গানে শুনেছি, কেবল স্ত্রী পুরুষে রমণ করা নয়/আত্মায় আত্মায় রমণ হলে রসিক তারে কয়।'

'ছাট কাট কথা, কিন্তু বস্তু আছে।' মনোহরা বলেছিল, 'মীরাবাঈ শ্রীরূপ গোস্বামীকে কী বলেছিলেন, জান?'

আমি মাথা নেড়েছিলাম, 'না।'

সেই সময়ে তিলকার আবির্ভাব হয়েছিল। সে দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'রঘু এসেছে। তার সঙ্গে পাড়ার কয়েকজন মুরুব্বি। গোঁসাইজী তোমাকে আসতে বললেন।'

স্পষ্টতই দেখেছিলাম, মনোহরার চোখে রুষ্ট ভ্রূকুটি। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'এ এক সংসার, বড় জ্বালা। তোমার খিদে পেয়েছে?'

বলেছিলাম, 'পরে খেলেও চলবে।'

'তবে আমি আসি। তুমি ঘরে থাক কি বাইরে যাও, যেমন খুশি।' মনোহরার মুখে অশান্তির ছায়া পড়েছিল। সে ঘরের বাইরে গিয়েছিল।

ফিরেছিল প্রায় এক ঘণ্টা পরে। আমি একবার ঘরের বাইরে গিয়েছিলাম। ঘড়িতে সময় দেখেছিলাম রাত্রি ন'টা। দক্ষিণের ঘরের পিছন থেকে নানা স্বরের কথা ভেসে আসছিল। ইচ্ছা ছিল গঙ্গার ধারে ঘুরে আসি। আখড়ার দরজা বন্ধ ছিল। খোলা উচিত বিবেচনা করিনি। ঘরে এসে, পুবের জানালায় দাঁড়িয়েছিলাম। মনোহরা আসার

পরে ঘটনা জানতে পেরেছিলাম। তিলিপাড়ার এক বধূ, নাম তার ব্রজবালা। স্বামী রঘুনাথ। ব্রজবালার বিয়ে হয়েছিল বারো বছর বয়সে। এখন চব্বিশ। নিঃসন্তান। ব্রজবালার ধর্মে মতি। সে ঘর ছেড়ে আখড়ায় চলে এসেছে। কিন্তু তার ধর্মে মতি বিষয়ে মনোহরার বিশ্বাস নেই। তার বিশ্বাস, আখড়ার মাধব নামে এক যুবক বাবাজীর ব্রজর ওপর অশেষ করুণা হয়েছে। ব্রজর এই প্রথম আখড়ায় আসা না। কয়েক মাসের মধ্যে মাঝে মাঝেই আখড়ায় পালিয়ে এসেছে। রঘু ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে।'

কিন্তু এবার ব্রজ বজ্র কঠিন। সে আখড়া ছেড়ে যাবে না। এ বিষয়ে গোলকদাসের সমর্থন রয়েছে। কিন্তু তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন মনোহরাকে। মনোহরা যা ব্যবস্থা করবে, তাই হবে। তিনি বুদ্ধিমান লোক। চোরকে বলেন চুরি করতে। গৃহস্থকে বলেন সজাগ থাকতে। মনোহরার ধারণা কী? ধারণা বিবিধ। ব্রজ অসুখী রমণী। শরীরে রূপ স্বাস্থ্য আছে। বুদ্ধি তেমন নেই। তাতে পাড়ায় কিছু কুৎসাও রটেছিল। রঘু নাকি রঘুপতির মতোই বৃষস্কন্ধ বলবান পুরুষ। অন্তত চেহারায় আর কাজে তারই প্রমাণ। মানুষ ভালো, কিঞ্চিৎ গাঁজা ভাঙে আসক্তি। কিন্তু ব্রজ অন্তপ্রাণ। কোনোদিন ব্রজর গায়ে হাত তোলেনি। ঝগড়া বিবাদ করেনি। বরং ব্রজর হয়ে শরিকদের সঙ্গে ঝগড়া করে। ব্রজর বিষয়ে সে কটু কথা শুনতে নারাজ।

রঘু ব্রজর স্বামী, ব্রজ ছাড়া জানে না। ব্রজ এখন মাধব বাবাজী ছাড়া সংসার আঁধার দেখছে।

মনোহরা জানে না, ব্রজ আর মাধব কতোখানি এগিয়েছে। রঘু গাঁজা খেতে পারে, ভাঙ খেতে পারে। তার শালীনতা বোধ আছে। সে তার স্ত্রী সম্পর্কে গ্রামে কিছু বলে বেড়ায়নি। সে বিশ্বাসও করে না, স্ত্রী নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এ সব নিয়ে মাথাব্যথা শরিক আর পাড়ার লোকের। রঘুর প্রতি মনোহরার একটি প্রীতি বোধ আছে। কিন্তু ব্রজবালার প্রতি আছে তার একটি নারীর স্নেহ। তার বিশ্বাস, ব্রজর নারীত্বের বিকাশ কোথাও অবরুদ্ধ হয়ে আছে। শুধু সেই কারণেই স্বামীত্যাগিনী হওয়াটা সমর্থনযোগ্য না। রঘুকে এভাবে আঘাত দেওয়া চলে না।

আজ ব্যাপারটা ঘটেছে অন্যরকম। রঘুর সঙ্গে তার প্রতিবেশীরা এসেছে। তাদের মতি গতি ভালো না। আখড়ার পক্ষে ক্ষতিকারক। তারা মাধবের চরিত্র নিয়ে কথা তুলেছে। বক্তব্য একরকম পরিষ্কার। মাধব বাবাজী ফুসলিয়ে ব্রজবালাকে আখড়ায় এনে রেখেছে। এর কোনো দায়িত্বই মনোহরা নিতে রাজী না। সে গোলকদাস গোঁসাইয়ের তুষ্ণীম্ভাব লক্ষ করেছে। ব্রজ বলেছে, সে আখড়ার সেবিকা হয়ে জীবন কাটাবে। মনোহরার পরিষ্কার কথা, তা হলে রঘুও আখড়ার সেবক হয়ে থাকবে। যদি রঘু তা না থাকে, মাধবকে আখড়া ছেড়ে যেতে হবে। এর কোনোটাই যদি না হয়, তবে ব্রজবালা আর মাধব যা খুশি তাই করতে পারে। আখড়ায় তাদের স্থান হবে না।

মনোহরার কাছে আখড়া আগে। তারপরে আর সব। তার কথায় রঘুর জ্ঞাতি প্রতিবেশীরা খুশি। রঘুও খুশি। সে তার স্থাবর জঙ্গম যা কিছু আছে, সব নিয়ে আখড়ার সেবা করতে রাজী। ব্রজকে ছাড়তে পারবে না। গোলকদাস এই প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন। ব্রজবালা আর রঘু দুজনেই আখড়ায় থাকবে। রাধা মাধবের সেবা করবে।

মনোহরার তৎক্ষণাৎ মত পরিবর্তন। সে বুঝতে পেরেছিল, গোলকদাসের এই সম্মতির মধ্যে দুইটি কারণ বর্তমান। রঘুর যা কিছু সম্পত্তি, সবই আখড়ায় বর্তাবে। মাধবের সঙ্গে ব্রজবালার লীলাও চলতে থাকবে। অতএব এ প্রস্তাবের পক্ষে তার সায় নেই। তার শেষ কথা, হয় ব্রজবালা আখড়ায় থাকবে, অথবা মাধব। দু'জনের একসঙ্গে আখড়ায় থাকা চলবে না।

মনোহরার কথা শুনে আমার মনে পড়েছিল কুয়োতলার বাক্যালাপ। নিতাইয়ের সঙ্গে ব্রজবালার। গোলকদাস বাবাজী তার আগে বলেছিলেন, তিনি আখড়ার মধ্যে কোনো গোলমাল পছন্দ করেন না। কিন্তু আসলে তিনি চান, মাধবের প্রকৃতি হয়ে ব্রজ আখড়ার সেবিকা হবে। রঘু থাকলেও ক্ষতি নেই। মনোহরা তা নাকচ করেছে। ব্রজবালা মনোহরার পায়ে পড়ে কেঁদেছে, 'কেন তুমি আমার সাধে বাদ সাধছ?' মনোহরা বুঝতে পারে, ব্রজর আসল দুঃখটা কোথায়। সে মাধব বাবাজীর প্রেমে পড়েছে। কিন্তু রঘু তার স্ত্রীকে ভালবাসে। মনোহরা আমাকে বলেছিল, 'আমি ব্রজর কানে মন্ত্র দিয়েছি।'

'কী মন্ত্র?'

'তুই আমার আখড়া ছেড়ে চলে যা। মাধব বাবাজীর সঙ্গে যেখানে খুশি যা। মাধব বাবাজীর যদি মনের জোর থাকে, তোকে নিয়ে কোথাও না কোথাও সে ঠাঁই নিতে পারবে।'

আমি হেসে বলছিলাম, 'তা হলে রঘুর কী হবে?'

'সব দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা তো আমার নেই।' মনোহরা বিচলিত হয়ে বলেছিল, 'আমি তো দুকুল রাখতে শিখিনি। হয় কুল রাখতে পারি না। নয় তো মান। আখড়ার কথা আমাকে ভাবতে হবে। ব্রজ এখন আগুন। প্রকৃতির মধ্যে আগুন থাকে। সে আগুন নিয়ে সবাই খেলতে পারে না। আমি নিজে একটা মেয়ে। ব্রজর অবস্থা বুঝি। কিন্তু এ আগুন আমি আখড়ায় রাখতে পারিনে। রঘু মাধব একসঙ্গে থাকলে, গোলমাল একদিন লাগবেই। আমি সব সময় হুতোশে মরব। আমি ব্রজকে বিদেয় করেছি। রঘু বউ নিয়ে বাড়ি গেছে। এখন মাধব যদি ব্রজকে নিয়ে কোথাও চলে যায়, যেতে পারে। কিন্তু সেখানেও আমার ভয় আছে। আমি যে ঘরপোড়া গরু। মাধব প্রকৃতি সেবা করতে গিয়ে, প্রকৃতিটিকেই হয়তো কোথায় বিসর্জন দিয়ে আসবে।'

আমি দ্বিধার সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি তা হলে মাধবকে বিশ্বাস করেন না?'

'যদি করতে পারতাম, তা হলে আগে তো রঘু আর ব্রজর এক সঙ্গে আখড়ায় থাকবার ব্যবস্থা করতাম।'

মনোহরার চোখে উদ্বেগ ফুটেছিল, 'কিন্তু তোমাকে তো বললাম, আমাকে সব সময়ে একটা হুতোশ নিয়ে থাকতে হবে। তা আমার সইবে না। এবার তুমি বল তো, আমি কিছু ভুল করেছি?'

মন্তব্য করা কঠিন। বুঝতে অসুবিধা হয়নি, মনোহরার কাছে আখড়া কুল মান দুই-ই। মাধবের প্রতি তার বিশ্বাস নেই। অথচ সে এই আখড়ার এক বাবাজী। বরং তার প্রাণের টান রঘু আর ব্রজর প্রতি। এখানে সে মানবী। অন্যদিকে, তাঁকে আমি দেখছি বুদ্ধিপরায়ণা অধ্যক্ষার ভূমিকায়। বলেছিলাম, 'আখড়াকে আপনি ভেজাল মুক্ত রাখলেন। ব্রজবালার ভবিষ্যৎটা বুঝতে পারছি না।'

'আমি পারছি।' মনোহরার চোখে অন্যমনস্কতা। রুদ্ধ স্বরে ছিল উদ্বেগ, 'ব্রজকে আমি বিসর্জন দিয়েছি। রঘু ওকে বাঁচাতে পারবে না। মাধব ওকে ভালোবাসে না। ব্রজ মুখপুড়ি যে তা বুঝতে পারছে না, সেজন্য ওকে দোষ দিই নে। মেয়েটা যে কোথায় মরছে, তা তো বুঝতে পারছি। রঘু যদি সামাল দিতে পারত, তাহলে সব গোল চুকে যেত। রঘু ঈশ্বরের অনাসৃষ্টি। পুরুষ মানুষের এর চেয়ে অভিশাপ আর কী আছে। তা যদি না হত, ব্রজর মতো মেয়ে কখনো স্বামী ছাড়তে চাইত না। প্রকৃতির আর এক নাম রতি। সে যখন জাগে, তখন তার বাছবিচার থাকে না। ব্রজকে কে রক্ষা করবে?'

এ সব কথার জবাব দিতে পারিনি। মনোহরার উদ্বেগ অসহায়তা আমাকে একরকমে আতুর করেছিল। সেই সঙ্গে এক নিগূঢ় বিস্ময়। যে-রমণীর এমন অনুভূতি, সে কেমন করে এই জীবন কাটাচ্ছে?

এই জিজ্ঞাসাটা রইলো আমার, জগতের সকল মহৎ প্রাণের কাছে। এক গণ্ডগ্রামের সীমানা পেরিয়ে, আধুনিকতার আলোর প্রাঙ্গণে। আমার কোনো জবাব জানা নেই। বুকের কাছে দু'হাত জড়ো করে, কেবল নির্বাক অবস্থায় বিস্ময়ে মনোহরার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি। তবু একটা জবাব পেয়েছিলাম মনোহরার কাছ থেকেই।

মনোহরার ত্রি-রক্ষা করেছিলাম। তিন রাত্রি ছিলাম। বসে থাকিনি। সুখড়িয়া ঘুরে এসেছি। সঙ্গে ছিল নিতাই। শ্রীপুরের মিত্র মুস্তৌফি বংশেরই আর এক ধারার কীর্তি সেই গ্রামে। এখানেও সেই এক বয়ান। আনন্দরাম মুস্তৌফিও ছিলেন গঙ্গার পূর্ব তীরে উলা গ্রামে। মন কষাকষি নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে। রামেশ্বর পুত্র রঘুনন্দনের সঙ্গেও সেই একই বিরোধ বৃত্তান্ত। তিনি এপারের আঁটিশেওড়ায় এসে, গ্রামের নাম দিয়েছিলেন শ্রীপুর। আঁটিশেওড়া ছিল বাঁশবেড়ের রাজার। সুখড়িয়া ছিল বর্ধমানের রাজার অধীনে। মুস্তৌফিদের সঙ্গে নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধ বিবাদের কারণ যথার্থ

জানা যায় না। সম্ভবতঃ ব্যক্তিত্ব ও যশের সংঘাত। অথবা হতে পারে, সম্পত্তি আর মর্যাদার বিষয়। আনন্দরামের ছেলে অনন্তরাম চলে এসেছিলেন সুখড়িয়ায়। বর্ধমান রাজা তিলকচাঁদ, সুখড়িয়া গোপীনগর ইত্যাদি স্থান, তাঁর নামে বিক্রয় কোবলা লিখে দিয়েছিলেন।

প্রথমে মনে করেছিলাম, শ্রীপুর সুখড়িয়া পাশাপাশি গ্রাম। একরকম বলতে গেলে তাই। কিন্তু দু-মাইলটা কিছু না। তার মাঝে আছে কিছু ছোট গ্রাম আর পাড়া। বর্ধমানের দত্ত মুস্তৌফিদের বাড়ির এক বন্ধু সেই যে কবে কানে ঢুকিয়েছিল শ্রীপুর সুখড়িয়ার কথা, তারপর থেকে আর ভুলতে পারিনি। আগে বলেছি, চল্লিশের দশকে তখন বন্দুকের কারখানায় নোকরি করতাম। ছেলেবেলায় ইস্কুলের ক্লাস থেকে রূপের হাতছানি আমাকে চিরদিন ডেকে নিয়ে গিয়েছে। এর কার্যকারণের সন্ধান আজ পর্যন্ত পাইনি। শৈশবে বুঝতে পারিনি, জীবনটা সকলের এক মাপে ছকে বাঁধা না। এক ঔরস গর্ভে জন্মেও না।

রূপে মজেছি সেই কোন্ কালেই। কিন্তু রূপ তো মহাপ্রাণীটাকে ধরে রাখতে পারে না। অতএব, বাঁচতে হলে কাজ চাই। শ্রম চাই। শ্রমে বিরাগ নেই। শ্রমের রকম কেমন? মনের মতো তো? তা হলে আর এ সংসারে রাগ চলে না। সংসারের তাবৎ মানুষের এই একটা বড় সংকট, মনের মতো কাজ মেলে না। যদি মিলতো, এ পৃথিবীর রঙ রূপ বেবাক আলাদা হয়ে যেতো। সেখানে সব আলা মাটি চাল। বৃহৎ সভ্যতার বাঘ চালের ঘরে, ঘুঁটিগুলো সব অন্য খেলোয়াড়দের হাতে। খেলার চালে ঘুঁটি চলে। ঘুঁটির নিজের সত্তা নেই।

থাক, এ সব সাতে পাঁচের কথা পেড়ে লাভ নেই। নোকরিটাও করতে পারিনি। তখন যে মনে হয়েছিল, এ সংসারে বড় অন্যায় আর অসাম্য। ওটাও একটা রূপের ফের। সেই রূপের ফেরে ফিরতে গিয়ে, নোকরি খতম্। কিন্তু সেটা জীবনে একটা নিরিখ দিয়েছিল। সেই নিরিখটাই, মানুষের অপরূপের রূপের বৈচিত্র্য। মানুষ খেলছে নানা স্থানে। সেও এক রূপের অঙ্গনে। দেখছি, আজও সেই টানেই চলেছি। ছেলেবেলায় ছিল অনেক শাসন কষন। এখনও নেই, এমন বলতে পারি না। শাসন কষনটা এখন, মর্ গিয়ে তোর রূপের ফেরে। আমরা চেয়ে দেখতে যাচ্ছি না।

এ কৈফিয়ৎ না। মনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ কথা। মনোহরার নানান কৌতূহল। কেমন করে দিক নির্ণয় হয়? আগে থেকে কেমন করে জানতে পারো, কোথায় কে কোন দেব দেউল মন্দির গড়ে রেখেছে। জবাব তো একটাই। সংসারে অনেক লোক আছে, খবর তাদের গুঞ্জনে। আর দেশ পরিচয়ের ইতিহাসের সন্ধানী যাঁরা, তাঁরা আমার থেকে অনেক বড় জাতের রূপখোর। তাঁরা আদি অন্তের শুলুক সন্ধান রেখে গিয়েছেন জীবনপাত করে। ইতিহাস ভূগোল সমাজ সংস্কৃতি আর মনুষ্য সব নখের দর্পণ থেকে দেগে দিয়ে গিয়েচেন কাগজের দর্পণে। অতএব সুখড়িয়ার আদি বৃত্তান্ত

অজানা থাকবে কেন? মনোহরা শুনে অবাক, 'এত কাল রয়েছি। পাশের গাঁয়ের কথা কিছু জানিনে। তুমি গড়গড়িয়ে বলে যাচ্ছ, কে কবে কোথায় এসে ঠাঁই নিলে, আর গড়বাড়ি মন্দির করলে। তা হলে তোমার রূপের খোঁজে আরো কিছু আছে। সেটা কী?'

বলেছি, 'নিজের হদিশ করা। কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম, কেমন করে, আর কেন, এইটে জানার একটা সাধ। সামনেটাকে দেখতে ইচ্ছা করে।'

'সেটা আবার কী?'

'ভাঙাচোরা পথের ওপর দিয়ে, নতুন সমাজটা জন্মাচ্ছে কেমন করে। সেইজন্যেই একবার পেছন ফিরে দেখা। পেছনটা চিনলে পরে, সামনের দিকের একটা দাগ দেখা যায়।'

'ভেঙে বল। আমি তোমার মত করে বুঝতে পারি নে।'

হেসে বলেছি, 'ভেঙে বলবার মতো কথা খুঁজে পাই না। আজকাল দেখি, সবাই হাল হকিকৎ সরস করে বাতলে দেয়। শুনে বুঝতে পারি না, সেই হাল হকিকতের আগা পাছা কিছু আছে কী না। কিন্তু তারা বড় পণ্ডিত। আপনি হয় তো শোনেন নি কখনো, একদল লোককে কলকাতায় আঁতেল বলে। তারা সব জান্তা।'

'আঁতেলটা কী জাত?'

'এক অর্থে নাকি আধুনিক । তারা আধুনিক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। হাতে তাদের ধারালো তলোয়ার আছে। বেফাঁস কিছু বললেই, কুচ্‌ করে গলা কেটে দেয়।'

'ও বাবা! সে তো সাংঘাতিক! তাদের তো কোনদিন দেখিনি?'

'দেখবেন কী করে? তারা তো আপনাদের ধারে কাছে আসে না। কিন্তু আপনারা আছেন কি নেই, তা তারা এক কথায় বলে দিতে পারে।'

'না দেখেই?'

'হ্যাঁ, তবে বইয়ের পাতা ওলটায়। তাতেই ছক কেটে, জ্যোতিষীর মতো সব বাতলে দিতে পারে। তারা যদি বলে আপনারা আছেন, তো আছেন। যদি বলে নেই, তবে নেই।'

'তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?'

'ওঠা বসা কথাবার্তা আলাপ পরিচয় সবই আছে।'

'তোমার মুখ থেকে যখন আমাদের কথা শুনবে, তখন কী বলবে?'

'ইংরেজীতে ভাববে, বাঙলায় হাসবে।'

মনোহরা হেসে বাঁচেনি, 'তুমি আবার আমাকে রূপ দেখাচ্ছ।'

'সেটা সত্যি। ওটাও একটা রূপ।'

সুখড়িয়া অচেনা জায়গা না। মনোহরা কয়েকবার ঘুরে এসেছে। তবু, বহু চক্র শোভিত অনন্তদেব শালগ্রাম শিলাটি যে আনন্দরাম মুস্তৌফির ছেলে অনন্তদেব তাঁর নিজের নামেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এ খবর জেনে সে অবাক খুশি। সময় জেনে

আরও খুশি, একশো পঁচানব্বুই বছর আগে। কাঁটা ঝোপ জঙ্গল গ্রামের সর্বত্র। পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা, গঙ্গার পূর্বকূলে যতোটা আস্তানা নিয়েছে, পশ্চিমকূলে এখনও অতোটা না। তবে একেবারে অনুপস্থিত না। সেই উপস্থিতি দুশো বছরের পুরনো গ্রামকে কোথাও ছুঁতে পারেনি।

সুখড়িয়া এখন গণ্ডগ্রাম। শ্রীপুরের মুস্তৌফিদের মতো গড়বেষ্টিত অট্টালিকা হয়নি। কিন্তু প্রাচীন বাড়িটি তার হৃত গৌরব নিয়ে, কালের থাবায় জীর্ণ বিবর্ণ। শ্যামরায় নামে আছেন রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি। এ যদি হয় বৈষ্ণবধারা, তবে সঙ্গে সঙ্গেই তার সঙ্গে অনন্তদের বারোটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বৈষ্ণব শৈবের পাশাপাশি বাস। তা বলে শক্তি কখনও বাদ থাকেননি। আনন্দময়ীর মন্দির তার প্রমাণ। কালের থাবা তার গায়েও আঁচড় কাটতে ছাড়েনি। অথচ বয়স বেশি নয়। বাঙলা সালের বারোশো কুড়িতে প্রতিষ্ঠা। বাঙলা দেশের কোনো গ্রামে এতো উঁচু মন্দির আর দেখেছি বলে মনে করতে পারিনি। কেতাবে বলে সত্তর ফুট আট ইঞ্চি। ঘাড় তুলে দেখতে গেলে আরও বেশি মনে হয়। মন্দিরের চূড়া সংখ্যা পঁচিশ। আঠারোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে, প্রলয় এক ভূমিকম্প। পাঁচ চূড়া তাতেই ধরাশায়ী। অবিশ্যি পরে আবার নির্মাণ হয়েছিল। কিন্তু আদিরূপের সঙ্গে কতোটা মিল, সে-খোঁজ বিফল। তবে মন্দিরের গায়ে এখন পোড়া মাটির কারুকার্য মনোহারিণী। সেখানেও সকলের অধিষ্ঠান। রাধাকৃষ্ণ, জগদ্ধাত্রী, রাম-সীতা, সিংহবাহিনী। মন্দিরের মধ্যে শায়িত আছেন শিব। তাঁর বুকে বসে আছেন আনন্দময়ী কালী। এই বুকের ওপর বসে থাকাটা আমার মস্তিকে ঝংকার দিয়েছিল। কামাখ্যা পাহাড়ে এক তন্ত্রসাধকের ঘরে একটা পট দেখেছিলাম। শায়িত শিবের বস্তিদেশে বসে আছেন নগ্ন শ্যামা। সাধক ব্যাখ্যা করেছিলেন, এই শ্যামা বিপরীত তরীতুরা। সুখড়িয়ার আনন্দময়ীও কি তাই? দেখে সেই রকমই ধ্যান দেয়। বিপরীত তরীতুরার সঙ্গে আনন্দের যোগ আছে। সে আনন্দ শক্তিসাধকের সাধন কথা।

আমার চোখের সামনে সেই কল্পনার ছবিটা ভেসে ওঠে। এই সব মন্দির বিগ্রহের গড়নদার শিল্পী কারিগররা কোথায় গেল? একি কেবল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ? মানুষগুলোর বংশধরেরা আজ কোথায়? মাঠে ঘাটে দরিয়ার ডিঙায়?

আরও আছে, হরসুন্দরী কালীর মন্দির। আছে না, ছিল। নয়টি চূড়ার সবই ভূমিসাৎ। চারদিকে ধ্বংসের লীলা। আশেপাশের নিবিড় ঝোপ জঙ্গলে ইতিহাস নির্বাক। কেবল পাখিরা কথা কয়। পতঙ্গরা মৌনতাকে ভাঙতে পারে না। অটুট কেবল বারো শিব মন্দির। চৈত্র মাসের শেষ সংক্রান্তি আসন্ন। সব গ্রামেই এখন, গেরুয়া ছোপানো বস্ত্র অনেকের অঙ্গে গোবিন্দগঞ্জের রাম ছুতোরের মতো। গাজনের আয়োজন সর্বত্র।

শোন, জয়বাবা বুড়ো শিবের লাগি-ই-ই-ই। আর মন্দিরের আশেপাশে দু'চার সন্ন্যাসীর জমায়েৎ। সারা দিনের উপোসের সঙ্গে, গাঁজার দম আটকায় না।

ভোরবেলা বেরিয়ে ফিরতে ফিরতে আকাশের পশ্চিম মুখ লাল। তার মধ্যে, নিতাই বৈষ্ণব গাজনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দুই চার দম দিয়ে নিয়েছে। দমের ঘরে কথা থাকে। কইতে নেই। তবে, 'বাবাজী, আপনাকে বলতে দোষ নেই। কথাটা আখড়ায় পাঁচ কান না হয়। তিলকাকে আমি রাধা স্বরূপ দেখি।'

সে তো ভালো কথা। কৃষ্ণরূপে ভাবলেই হয়। হচ্ছে কোথায়? তিলকার মা রাধা সেও আছে আখড়ায়। বয়স্কা বৈষ্ণবী। সে বিধবা। তিলকাও বিধবা। বয়স মাত্র আঠারো উনিশ। মনোহরা ঠাকরুণের আপত্তি নেই। গোলকদাস বাবাজী ঝেড়ে কাসছেন না। কারণ? তিলকা প্রকৃতিটিকে তাঁর নিজের সেবনেচ্ছা। বাধা ভামিনী ঠাকরুণ। সেটা বড় বাধা না। বড় বাধা তিলকা। সে গোলকদাসের সেবা নিতে চায় না। কিন্তু তার মা চায়। কেন? না, তা হলে তিলকা আখড়ার একজন হয়ে উঠবে। কিন্তু তিলকা কি নিতাইয়ের সেবা চায়?

'তা যদি বলেন বাবাজী, পিকিতির মতিগতি বোঝা দায়।' নিতাই বাবাজী বড় অসহায় ভাবে বলেছে, 'অথচ দেখেন, গুরু আমার গোলকদাস গোঁসাই। পিকিতি সেবা তত্ত্ব দান করেছেন আমাকে। যোগবিদ্যা শিখিয়েছেন। শিক্ষাগুরু পেলাম না। শিক্ষাগুরু ছাড়া সাধন হয় না। তিনি হলেন শ্রীমতী। তার মতিগতি কিছু বুঝতে পারিনে। এ তো প্রেম পীরিতের মর্ম। চাইলে মেলে না। প্রেম গতিতে রসে রতি। প্রেম ছাড়া তো কিছু নেই। তাই নিয়েই আছি। কবে সে চোখ তুলে চাইবে, সেই আশায় আছি।'

রূপনগরের কতো খেলা। বাইরে সে এক রূপে। অলক্ষে অন্য ঝলক। সাধন ভজন জানি না। রহস্যও বুঝি না। দেখছি দুঃখের সাগর তিনকূলে। এক কূলে বসে কেবল সেই অথৈ দরিয়ার অকূলে চোখ। নিতাই তত্ত্ব সাধনের মুক্তি পথে যাত্রা করেছে। চোখে দেখছি এক বিষণ্ণ পুরুষ। নিতান্ত মানুষ। আর মানসিক যাতনা বয়ে বেড়াচ্ছে।

নবমীর পরে দশমীর রাত। সময় বড় কম। রাত পোহালে যাত্রা। গোলকদাস বাবাজী হেসে বলছেন, 'ত্রি-তেই তো সব নয় বাবাজী। ষড়রূপে থেকে যাও।'

কথার মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল। সম্ভবতঃ সহজিয়া ষড়রূপ, ষড়দলের কথা। ষড়দলে কি ষড়রিপু? কিন্তু আগে কোথাও যেন শুনেছিলাম, ষড়দল স্বাধিষ্ঠানচক্র। নাভির নিচে সে প্রেম সরোবর। গোলকদাসের ষড়রূপকে আমি ছ'দিন ভেবেই বলেছি, 'একাদশী পড়ে যাবে। আমাকে তার আগেই যেতে হবে।'

গোলকদাস রহস্য করে আরও অনেক কথা বলেছেন। ইঙ্গিতটা অস্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। কিন্তু মানুষটিকে কেন যেন মন নেয়নি। তিন রাত্রের মধ্যে একটা বিষয় বুঝেছি। গোলকদাস বাবাজী ক্ষমতা ভালবাসেন। বিষয় বুদ্ধি পাকা। অন্যদিকে তার সহজ সাধনায় এখনও প্রকৃতি সেবায় ঝোঁক বড় বেশি। একা রাধা প্রকৃতি তাঁর কাছে

বহু প্রকৃতিতে ঝলক দেয়। আরও যা বুঝেছি, মনোহরার সঙ্গে তাঁর একটা অন্তর্সংঘর্ষ চলছে নিরন্তর। মনোহরা সে-কথা আমাকে স্পষ্ট করে কখনও বলেনি। সেটা তার চরিত্র না।

মনোহরাকে একটা দিনই পুরোপুরি দেখতে পেয়েছি। শেষ দিন। আগের দিনটা সুখড়িয়া ঘুরে কেটেছে। পরের দিনও ইচ্ছা ছিল, আশেপাশের গ্রামে ঘুরে আসবো। মনোহরা যেতে দেয়নি। অথচ কাছে থাকেনি। সকাল থেকে তার বিস্তর কাজ। দেখে মনে হয়েছে, বিরাট এক সংসারের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব বহন করছে সে।

রাত্রে তার বাস দোতলার মন্দিরে। সেখানে রাত্রে কারোর প্রবেশ নিষেধ। ভোরবেলা সবাইকে যার যার কাজের নির্দেশ। কেবল ঘরে না, বাইরেও। দিনের বেলা আখড়ার আর বাইরের বাবাজী বোষ্টমী মিলিয়ে অতিথির সংখ্যা কম না। নিত্য ভোগ সকলের প্রাপ্য। অতএব, ভাঁড়ার থেকে, পাকশালায় সারাদিন সে ব্যস্ত। তার আগেই, ভোরে স্নান পূজা। মেয়ে পুরুষদের দিয়ে, গোটা আখড়া বাড়ি ধোয়া মোছা নিকানো। তার মধ্যেই বাবাজীদের নামগান চলছে। ছুটি তার বেলা শেষে। আহারও সকলের পরে। তবে, তাম্বুল তার মুখে থাকে সব সময়েই। ঠোঁট থাকে রঞ্জিত। মুখে হাসির ছটা। চোখে দ্যুতি।

শেষের দিনটা কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে অনেক। বীরভূমের এক বাউল আখড়ায় ছাড়া, আর কোথাও এমন নিবিড় আখড়াবাসী হইনি। তিলকা সারা দিনে অনেকবার চা দিয়েছে। প্রথম রাত্রের তুলনায় সে আমার কাছে অনেক সহজ হয়েছিল। ইচ্ছা করেছিল, নিতাইয়ের কথা তাকে বলবো। পারিনি। ভাবা যায়। বলা যায় না। অধিকারের প্রশ্ন আছে। এই সব সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে একটা কথা বুঝেছি। অনধিকার চর্চাটা ভালো না।

কিন্তু নিতাই তিলকার কথা মনোহরার সঙ্গে হয়েছে। আমি তাকে নিত্যইয়ের কথা না বলে পারিনি। পাঁচ কান না, এক কান করেছি। মনোহরা আমাকে হেসে জবাব দিয়েছে, 'সময় না হলে কিছুই হয় না বাবাজী। নিত্যইয়ের তাল আর তিলকার তাল এক নয়। ওটা যখন মিলবে, তখন ঠিক হয়ে যাবে। বাধা আছে। সে-বাধা কোনো কাজের নয়।'

সে-বাধা নিশ্চয়ই গোলকদাস গোঁসাই। আমি জিজ্ঞাসা করিনি। ভামিনীর অবকাশ বেশি। সে আমাকে পান খাইয়েছে। বলেছে, 'মনোহরার মত গুণ জানিনে বাবাজী। কিন্তু মনোহরার ত্রি তো রাখলে না?'

'তিন রাত্রিই তো কাটাচ্ছি।'

'তা সে তো সত্যিকারের তিন নয়। গৃহস্থের মঙ্গলের জন্য তেরাত্রি পোয়াতে হয়। ত্রি-তো অন্য বস্তু।' ভামিনীর টানা চোখের কালো তারায় রহস্যের ঝিলিক দিয়েছে।

বলেছি, 'আমি সেই ত্রি জানি না।'

'না থাকলে জানবে কেমন করে? থেকে যাও।'

যে-কথা মনোহরা বলেনি, সে-কথা অন্যের মানায় না। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থেকেছি। কিন্তু জানি, আমি মনোহরার অতিথি। বলেছি, 'থাকতে পারলে থাকতাম। আমার উপায় নেই।'

'উপায় তো মন।'

'মনের সেই অবস্থা নেই।'

'বাবাজী কি ত্রি বস্তু জান?'

'না।'

'রূপ স্বরূপ-রসের কথা জানা নেই?' ভামিনীর টানা চোখে ধনুকের টংকার ছিল।

মাথা নেড়ে বলেছিলাম, 'না।'

'আমি বলব?' ভামিনী যেন গোপন কথা ফাঁস করার ভঙ্গি করেছিল।

আমি জবাব দিইনি। তাকিয়েছিলাম তার রূপসী শ্যামা মুখের দিকে। ভামিনী বলেছিল, 'স্বরূপ, তুমি আগে রূপকে ধর। স্বরূপে আর রূপে মিলে, রসের জ্যোতি দেখতে পাবে।'

আমার কাছে সবটাই ধাঁধা। বলেছি, 'বুঝতে পারলাম না।'

তার মধ্যেই মনোহরা এসেছে। মাথার ঘোমটা খুলে, আঁচল দিয়ে মুখ গলা মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করেছে, 'কী বোঝাচ্ছে ওকে ভামিনীদি?'

'স্বরূপ রূপ আর রসের কথা।'

মনোহরা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'জবাব দিয়েছ?'

বলেছি, 'একথার জবাব তো আমার জানা নেই।'

'ভামিনীদি তোমাকে শান্ত হয়ে বসতে বলছে।' মনোহরার পান রাঙানো ঠোঁটে হাসির ঝিলিক। ভামিনীর দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'ও রূপের ফেরে ফিরছে। বাবাজীর শেষ জানা নেই ভামিনীদি। অভেদ ভাঙে মতি নেই। রূপে মজেছে, রূপ দেখেই যাবে। বসবার ঠাঁই করতে পারবে না।'

ভামিনীর অবাক মুখে গাম্ভীর্য নেমে এসেছিল, 'কেন বাবাজী, তত্ত্ব কী?'

'দাগা খাওয়া দাগাবাজ। ধোকা খাওয়া ধোকাবাজ। বুঝলে?' মনোহরা হেসে ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকিয়েছে।

ভামিনীর চোখে ধন্দ, 'বুঝতে পারলাম না গো মনোহরা।'

'বাবাজী নিজেকে খুঁজছে। বিস্তর পিছু টান, দড়ি ছিঁড়ে দৌড়ুচ্ছে।' মনোহরার চোখের দৃষ্টি সরেনি আমার মুখ থেকে, 'ও কাপড় রাঙায়নি। মন রাঙিয়েছে। ও ঠাঁই কার বসতে পারবে না। ভাল করে তাকিয়ে দেখনি বাবাজীর মুখের দিকে? প্রথম দিন দেখে কেমন খটকা লেগেছিল, তাই দুটো দিন আটকে রাখলাম।'

ভামিনীর ধন্দ তবু কাটেনি, 'ধরতে পারলাম না।'

'বাবাজী রূপে স্বরূপ খুঁজছে।' মনোহরা গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ভামিনীর চোখের দিকে, 'সে সব আমাদের রূপ স্বরূপের তত্ত্ব নয়। জগৎ জুড়ে এত যে রূপ, সেই রূপে খুঁজে ফিরছে আত্মরূপ। কী, ঠিক বলিনি বাবাজী?' ঘাড় কাত করে তাকিয়েছিল আমার দিকে।

বলেছিলাম, 'কথাটা বড় কঠিন লাগছে। আপনার মতো করে ভাবতে পারি না।'

'আত্মানুসন্ধান।' মনোহরার স্বরে যেন দৈববাণী ঘোষিত হয়েছিল। সে এক পা এগিয়ে দাঁড়িয়েছিল। চোখে অপলক প্রতিমা দৃষ্টি, 'মানছ?'

এমন করে বলে, মনের কোথায় ঠেক লেগে যায়। অথচ সত্যটাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। বলেছি, রূপের ফেরে ফিরি। কোথাও কি নিজেকে দেখতে চাই না? কারা যেন বলেছেন, মানুষের সব থেকে বড় সংকট, সেলফ্ আইডেণ্টিফিকেশন। সেই গানের কথার মতো, 'যা ভাল করে পড় গা ইস্কুলে/নইলে দুঃখু পাবি শ্যাষকালে।' 'আপনারে চিনলে পরে/চেনা দেবে অপরে।' ভালো করে ইস্কুলে পড়াটা আমার কাছে সেই ধ্যানে আছে। অরূপের সন্ধান জানা নেই। রূপনগরে চলার পথে, বুকের ধুকধুঁকিতে সেই কথাটা কি অষ্টপ্রহর বাজে না, এখানে আমি কে? আমি কোথায়? কিন্তু আত্মানুসন্ধান। সে যে ভারি বড় আর গম্ভীর শোনায়। বলেছিলাম, 'নিজেকে দেখতে ইচ্ছা করে।'

'কথা বানাও, না?' মনোহরার হাত উঠেছিল আবার মারের ভঙ্গিতে। এগিয়ে এসেছিল আর এক পা। আমার মাথার চুলে হাত ছুঁইয়ে দিয়েছিল, 'না মারব না। তুমি তোমার মত বল। সেই ভাল।'

গোলকদাস গোঁসাইয়ের প্রকৃতি ভামিনীর চোখে যে-ধন্দ, সেই-ধন্দ, 'না, তোদের কথা কিছু বুঝতে পারলাম না গো মনোহরা।'

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতে আসতেই, জ্যোৎস্নাময়ী হয়েছিল রাত্রি। চৈত্রের বাতাসে কৃষ্ণকলি আর মাধবীর নিবিড় গন্ধ। সারা দিনে অনেক পাখির ডাক শুনেছি। সবাইকে চিনতে পারিনি। দোয়েল শ্যামা বুলবুলি আর টুনটুনিরা ঘরের আনাচে কানাচে। দুপুরটা সেই 'খোকা কোথা' ঘুঘুর দীর্ঘ ডাকের শোক। চড়ুই চটার কথাই নেই। কোকিল কখনও থামে না। রাত্রের বাতাস যতো উতলা, নদী যতোই তরল জ্যোৎস্নায় ঢেউ তোলে, কুহু কুহু যেন ততোই বাড়ে। বাকিদের চিনতে পারিনি।

পূজারতির শেষে, নিজের ঘরে এসে সিগারেট ধরিয়েছি। পুবের জানালাটা খুলে দিয়ে, ঝুপসি অন্ধকারে জ্যোৎস্না ছড়া। মনে হলো, নিঃসঙ্গ তরল স্রোতে বহতা গলিত জ্যোৎস্নাধারা যেন কোন্ এক মাঝিকে ডাকছে।

'বাতিটা উস্‌কে দাওনি।' মনোহরা এসে ঢুকলো, 'একলা হলেই কেবল নদীর দিকে তাকিয়ে থাক? কী দেখ তাকিয়ে?'

মনের কথাটা মুখ থেকে খসে পড়লো, 'মনে হলো নদী বড় একলা। একটাও নৌকা নেই, মাঝি নেই।'

'তা হলে একলা নদীর জন্য তোমার মন কাঁদে?' মনোহরার ডাগর কালো চোখে বিস্ময়, 'তোমার মনের গতি কত দিকে। নদীর জন্যে মন খারাপ করতে কাউকে আজ পর্যন্ত দেখিনি।'

বললাম, 'দেখতে ভালো লাগে।'

'কিন্তু কিছুই মনের মতো হয় না।' মনোহরা হাত তুলে, হ্যারিকেনের সলতে উস্‌কে দিল, 'নিজেও জান এমন খাঁ খাঁ করছে কত নদী। মাঝি নেই তার জলে। তাহলেই বোঝ, কোথাও একটা মানান চাই। তা সে কথা বলে তোমাকে লাভ নেই। মানান বেমানানটা তুমি বুঝতে পার। বস।'

জানালা থেকে ফিরে এসে তক্তাপোষে বসলাম। জানি, আমার কাঁধ ঝোলা জামা কাপড় সব গোছানো শেষ। এখনও আমার গায়ে মনোহরার দেওয়া ধুতি। গতকাল যে জামা ধুতি পরে সুখড়িয়া গিয়েছিলাম, তাও ধুয়ে শুকিয়ে পাট করে ঝোলা জাত হয়েছে। মনোহরা বসলো তক্তাপোষের আর এক ধারে। চোখে চোখ পড়তেই সে হাসলো, 'কথা রাখলে, মনে থাকবে। অযত্নের কথা তো জিজ্ঞেস করতে পারি নে। তোমার মতো মানুষ কখনো সে সব কথা মুখ ফুটে বলবে না।'

আমি হাসতে গিয়ে, কোথাও একটা ঠেক খাচ্ছি। দু' দিন বুঝতে পারিনি, কোথায় যেন মনে একটা ঢ্যারা পড়েছে। বললাম, 'অথচ সবই মনে থাকবে। ডুমুরদর বাঁড়ুজ্জে মশাই এখানে আসতে বলেছিলেন। তাঁর কথা না শুনলে ভুল হতো।'

'বলছ?' মনোহরার চোখের তারা অপলক। বুকের কাছে কি নিঃশ্বাস আটকানো? বললো, 'সেই বাঁড়ুজ্জে মশাইকে গোঁসাই ঠাকুর মাতাল আর নাস্তিক বলেন।'

'আপনারও কি তাই মনে হয়?'

'না' মনোহরা মাথা নাড়লো, 'গোঁসাই যাই বলুন, নিজে ডেকে বসিয়ে তাঁর কথা শুনতেন। আমিও শুনেছি। একদিনও দোতলার ঘরে যাননি। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রাধাকৃষ্ণ দর্শন করেননি। কিন্তু চৈতন্যতত্ত্ব এমন করে বলতেন, মন্ত্রের মতো শুনতাম। মোটে তর্ক করতেন না। করবেন কার সঙ্গে? আর গীতার ব্যাখ্যা, ওরকমও কারুর মুখে শুনিনি। সবই বলতেন হেসে হেসে। গীতার কতরকমের ব্যাখ্যা। চোরের গীতা ব্যাখ্যাও শুনিয়েছেন, ডাকাতের ব্যাখ্যাও শুনিয়েছেন, আবার সংসারের স্বার্থপর মানুষও যে গীতার কত ব্যাখ্যা করতে পারে, শুনে হেসে বাঁচিনি। আবার সাধকের ব্যাখ্যাও শুনেছি। চালচুলো নেই একটা মানুষ, মদে মাতাল হয়ে আছেন। অথচ অমন তত্ত্বজ্ঞানী দেখিনি। কৃষ্ণদাস গোস্বামীর কথা মনে পড়ে যেত। আমাদের সহজ সাধনার কথা সব তাঁর জানা। শুনলে মনে হয়, কোন গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। নইলে অমন করে বলতেন কেমন করে? কিন্তু সবই যেন তাঁর রঙ্গ রহস্য। বাবাজীদের

পেছনে লাগতেন। গোলকদাস গোঁসাইকেও ছেড়ে কথা কইতেন না। তোমার সঙ্গে তাঁর কোথায় মিল আছে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ। তুমি মদ খাও না, তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর না। তবু মনে হয়, তোমাদের মধ্যে কেমন একটা মিল আছে। নেই?'

মনোহরা ঘাড় কাত করে তাকালো।

বললাম, বাঁড়ুজ্জে মশাই গুণী। আমি তা নই। তাঁকে আমার ভালো লেগেছিল। আমার মনের মতো মানুষ।'

'তবেই বোঝ।' মনোহরার ঘাড়ে ঝাঁকুনি, চোখের তারায় ঝলক, 'মনের মত মানুষ হওয়া কি যে সে কথা? সংসারে কে কার হতে পারে? আর কেমন করেই বা তোমাদের দেখা হয়? কে মিলিয়ে দেয়?'

এই মিলিয়ে দেবার মধ্যে আমি কোনো অলৌকিক দৈব নির্দেশ দেখি না। কিন্তু মনোহরার সেটাই বোধহয় বিশ্বাস। এক কথায় সে-বিশ্বাসকে ভাঙতে পারবো না। অতএব, তর্ক বহুদূর। কোন দৈব নির্দেশে এই আখড়ায় এলাম? থাকলাম? মনোহরা জিজ্ঞেস করলো, 'এবার বল, কেমন লাগল?'

আখড়াবাসের প্রশ্ন। বললাম, 'শুধু মুখের কথা শুনলেই কি খুশি হবেন? বলতে ইচ্ছা করে না?'

'সত্যি বলেছ।' মনেহরার অপলক চোখ আমার চোখে, 'ভুলে যাই, তোমাকে জিজ্ঞেস করা বৃথা। খত্ দিলে না তো? দেবে নাকি?'

দেখলাম মনোহরার চোখে ঠোঁটে উদ্‌গত হাসির উচ্ছ্বাস রুদ্ধ হয়ে আছে। আমার একটি কথায় খিলখিল ঢেউয়ে আছড়ে পড়বে যেন। বললাম, 'আমি তো সবখানে খত্ দিয়ে বসে আছি।'

মনোহরার উদ্‌গত রুদ্ধ হাসি উলটো কলে বইলো। ঠোঁট টিপে ভ্রূকুটি চোখে তাকালো, 'বিকিয়ে বসে আছ। কী রাগ যে হয়। ইচ্ছে করে, চুলের মুঠি ধরে ঘা দুচ্চার লাগিয়ে দিই।'

অট্টহাসি হাসতে পারি। স্থান বিশেষে ঠেক। তবু হেসে বললাম, 'মিথ্যা বলিনি।'

'কেন যে দাগাবাজ বলি, এবার বুঝতে পেরেছ?' মনোহরা ঝুঁকে পড়লো আমার দিকে। চোখের দৃষ্টি নিবিড়, 'দাগা খেয়ে দাগাবাজ। জানতেও পার না, দাগা দিচ্ছ কোথায়?'

বললাম, 'বিশ্বাস করুন, দাগা দিচ্ছি ভাবলে নিজেকে কেমন খাটো লাগে।'

'দাগা যখন খাও, তখন কি জানতে পার, কেন খেলে?' মনোহরা বাঁ হাতের তর্জনী তুলে আমার মুখের দিকে দেখালো, 'এই যে, এত দাগ চোখে? টের পেয়েছিলে কি, তোমাকে যারা দাগা দিয়েছে তারা খাটো না লম্বা? ওটা যে দেয়, আর যে খায়,

সেই জানে। এ কারুর ইচ্ছেয় হয় না। যাই হোক, বিকিয়ে যখন বসে আছ তখন এমনি করেই মাঝে মধ্যে বিকিয়ে যেও। আমি কিছু কেনাকাটা করে নেব।'

বললাম, 'এদিকে এলে আবার আসবো।'

মনোহরা খিলখিল করে হেসে উঠলো। গেরুয়ার আঁচল খসলো। হাসির মুখে হাত চাপা দিল না। দু'হাতে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়লো। তার হাসিতে আমার কথা দেওয়ার অন্তঃসারশূন্যতা বড় বেশি প্রকট হয়ে পড়লো। হাসতে গিয়ে ঠোঁট আড়ষ্ট। মনোহরা চোখ পাকালো, 'মিছে কথা ভারি খারাপ। বল, বিকিয়ে বসে আছি, কথা দেবার কিছু নেই। এইটুকু বলতে পারছ না? আমি পাড়াগাঁয়ের আখড়ার একটা বোষ্টমী, আমাকে তোমার রেয়াত কিসের?'

তাই কি? আমি আমার আধুনিকের জীবন দিয়ে, মনোহরাকে দেখেছি। আধুনিকের যুক্তি তর্ক বিশ্বাস, হৃদয়ের কোন্ কুলায় এসে জীবনের অব্যর্থ সন্ধানী হয়ে ওঠে, তার সংকেত পাইনি কি? বললাম, 'আপনাকে আমার নমস্কার।'

'এমন কত নমস্কার করেছ?' মনোহরার চোখে নিবিড় প্রশ্ন।

এই মুহূর্তে, মনে আমার সুখ দুঃখের নানা দোলা। বললাম, 'অনেক।'

'এই তোমার স্বরূপ।' মনোহরা এগিয়ে এসে, অনায়াসে আমার একটা হাত ধরলো। আমার হাত টেনে নিজের কপালে ছোঁয়ালো, 'এই নাও।'

এ মনের থই পাই না। কোন্ চোরা পথে কী যেন চুঁইয়ে ঢোকে। কথা বলতে পারি না। দেখি, মনোহরার কপালের রসকলির দাগ লেগে যায় আমার হাতে। আমি তার যৌবনের ঘন সান্নিধ্যে বসে আছি। মনে পড়ছে, সে আমাকে কোলে বসিয়ে খাওয়াতে পারে। শ্রদ্ধা আর বন্ধুত্ব হাত ধরাধরি করে আছে। আমি তার পায়ের দিকে তাকালাম। চিকন ত্বকে কি কিরণ।

মনোহরা আমার হাত ছেড়ে দিল, 'তা হলে এইটুকুই থাকল। স্বরূপে থেক।'

আমি মনে করিয়ে দিলাম, 'মীরাবাঈয়ের কথা কী বলবেন বলেছিলেন?'

'মীরাবাঈ?' মনোহরার চোখে জিজ্ঞাসু ভ্রূকুটি।

বললাম, 'রূপ গোস্বামীকে তিনি কি বলেছিলেন, সেই কথা?'

'তোমাকে সে কথা বলব বলিনি তো?' মনোহরার চোখে বিস্ময়, 'তুমি জান কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

বললাম, 'জানিনে।'

'তোমার বাঁড়ুজ্জে মশাই সে সব জানেন।' মনোহরার ঠোঁটে হাসি, 'কিন্তু সে সব তত্ত্বের বাখান। আমার কাছে শুনবে?'

'আপনার যদি আপত্তি না থাকে।'

'প্রকৃতির মুখে এসব শোনার অর্থ জান?' মনোহরার ঘাড় কাত্, চোখে গভীর জিজ্ঞাসা।

মাথা নাড়লাম। মনোহরা মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো, 'তুমি তো তত্ত্বে নেই। আমাকে গুরু বলে মানতে হবে যে?'

'আপনাকে তো নমস্কার বারে বারে।'

আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম তার পায়ের দিকে। মনোহরা হাত চেপে ধরলো, 'বুঝেছি। তত্ত্বে বলে প্রকৃতি শিক্ষাগুরু। তোমার সে শিক্ষায় দরকার নেই। রূপ গোঁসাইকে মীরাবাঈ রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব বুঝিয়েছিলেন। গোঁসাই তো বৈরাগী, মীরাবাঈয়ের কাছে যেতে পারেন না। স্ত্রীলোক ডাকলে যেতে নেই। তার সঙ্গে আবার কিসের তত্ত্বকথা? তো একদিন ভিক্ষে করতে করতে গোঁসাই হাজির মীরাবাঈয়ের দরজায়। মীরাবাঈ শুনলেন, এই সেই গৌড়ের বৈরাগী। মূর্খ গোঁসাই বলে হেসে চলে গেলেন। কথা বললেন না। রূপ গোঁসাইয়ের মনে খটকা লাগল। এমন ঠাট্টা-বিদ্রূপ কেন? ফিরে গেলেন মীরাবাঈয়ের কাছে। মীরাবাঈ বললেন, বিষ্ণুতত্ত্ব মানুষের শরীরে। তুমি নিজে কৃষ্ণ নও? কী শাস্ত্র পড়েছ? শ্রীবৃন্দাবন যদি পেতে চাও, তবে পাবে এই শক্তির কাছে।' মনোহরা নিজের বুকে হাত ছোঁয়ালো, 'বুঝলে?'

আমি মাথা নাড়লাম। অথচ তান্ত্রিক বাউলদের সাধনার একটা সংকেত যেন রয়েছে। মনোহরা চোখ বুজে দীর্ঘ কবিতা বলে গেল। কবিতা না, তত্ত্বের বাখানি। মনে রাখা সম্ভব না। 'সহস্রদল পরম কিশোরীর মস্তক উপরে/তাহার ভিতরে রহে রজ শতধারে/তাহার অঙ্গেতে হয় মানুষের গতি/শৃঙ্গার ভজন করে বীজরূপে স্থিতি/ঈশ্বর মিলিবে বলি মানুষ চলি যায়/আগে রক্ত চলে পাছে রস রূপে ধায়।'

মনোহরা কতোক্ষণ বললো, কতোক্ষণ শুনলাম, ঘড়ির ঘণ্টায় তার হিসাব নেই। কিন্তু আমার বিভ্রান্ত বিস্ময়ের সীমা নেই। মীরার ভজন নামে এতোকাল অনেক গান শুনেছি। এমন পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব কখনও শুনিনি। শুনে থাকলেও বুঝতে পারিনি। বিরহে কাতর, মিলনে সুখ, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক এমন পদ মীরাবাঈয়ে শুনেছি। মনোহরা অনায়াসে যে-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলো, সে তো সেই বেদ বহির্ভূত তান্ত্রিক ব্যাখ্যা। এখানেও সেই ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের কথা। পদ্ম কেমন করে ফোটে, ফুলের রসে কীভাবে সাধন হয়, সেই কথা। সহস্রদল হতে রজঃস্রোতের সঙ্গে রসরাজের মিলন ঘটে। তিন দিন তিন রূপে থেকে সহজ মানুষরূপে তাঁর প্রকাশ। প্রকৃতি পুরুষের শৃঙ্গারে ঊর্ধ্বগতি হয়ে, যুগলের নিত্যরস লীলা সাধন। এ তো বাউলের তত্ত্ব। কে আগে, কে পরে? ইতিহাসের সংকেত বোধহয়, সহজিয়া বৈষ্ণবই বাউলের আগে। কিন্তু মীরাবাঈকে যে চিরদিন অন্যরূপে দেখে এসেছি। তাঁর এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা জানা ছিল না।

মনোহরাকে মনে হলো, সে যেন গভীর সুপ্তি থেকে জেগে উঠলো। ঘামে ভিজে গিয়েছে মুখ গলা। ভিজে উঠেছে বুকের জামা। যেন সম্মোহিতা। চোখ আরক্ত। খোলা দরজার বাইরে দশমীর জ্যোৎস্নার তরঙ্গ। আখড়ার লোকজনের সাড়া শব্দ নেই। কেবল কুহু কুহু কখনও থামে না। অম্বুরি তামাকের মৃদু গন্ধ গোলকদাস

বাবাজীর অস্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। মনোহরা আস্তে উঠে দাঁড়ালো। পুবের জানালার কাছে গেল। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। কিন্তু মস্তিষ্কের কোষে কোষে নানা ি জ্ঞসা যেন অজস্র বন্দীর মতো চিৎকার করছে।

সিতশোণিতবিন্দুযুগলং রজঃবীজের মিলন। দেহতত্ত্বের সেই এক ব্যাখ্যা। আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে প্রকৃতি মনোহরা। তার সাধনা কী? এই তত্ত্বের সঙ্গে, তার যোগ কোথায়? 'আলিঙ্গনে ভাব পূর্ণ কান্তিতে চুম্বন/শৃঙ্গারে প্রেম রস বাঞ্ছিতপূরণ।'... মনোহরার কথা। যৌবন যার সারা অঙ্গে জ্যোৎস্না তরঙ্গ দরিয়ায় উথালি পাথালি। সে কেবল বিগ্রহের কাছে সঁপে দিয়ে আছে। তবে কেন, 'কাম রতিতে ঊর্ধ্বগতি।'

'অনেক রাত হল বাবাজী। এবার খেতে দিই।' মনোহরা সরে এলো জানালার কাছ থেকে। কিন্তু তার দৃষ্টি নেই আমার দিকে।

বললাম, 'চলুন যাই।'

'আজ আর এত রাত্রে যেতে হবে না কোথাও। ঘরে বসেই খাও।' মনোহরা ঘরের দরজার কাছে গেল, 'নিতাই এখানে আছে। হাত মুখ ধুয়ে এস।'

হাত ধুয়ে ঘরে ফিরে দেখি, আসন পাতা। কলাপাতায় ভোজ্য। গেলাসে জল গড়ানো। আখড়া নিঝুম। মনোহরা বসে আছে মেঝের এক পাশে। মহাপ্রাণীও কোথায় ঠেক খেয়েছে। ক্ষুধা বড় মন্দ। কিন্তু দেরি করা অনুচিত। আমার শেষ না হলে মনোহরার ছুটি নেই। কোনোরকমে খাওয়া সাঙ্গ করলাম। তিলকা এসে আমার পাতা গুটিয়ে নিয়ে চলে গেল। হাত মুখ ধুয়ে আবার ঘরে এলাম। মনোহরা হাসলো। অথচ তার মুখে সেই আচ্ছন্নতা। আমার মস্তিষ্কের বন্দী গরাদ ভাঙলো, 'মনোহরা দেবী।'

'দেবী?' মনোহরা অবাক চোখে তাকালো, 'বাবাজীর গোল হল। দেবী নই, দাসী। বাবা মা নাম রেখেছিলেন দুর্গা।'

সেও তো সুন্দর নাম। কিন্তু কহিতে ডরাই। অথচ মস্তিষ্কের বন্দীরা গরাদ ভাঙছে, 'এই যদি মূল তত্ত্ব তবে আপনি—?'

কথা শেষ করতে পারি না। মনোহরা মাথা নাড়লো, 'অনেক নিংড়ে নিয়েছ বাবাজী, আর নিও না।'

একেবারে পাথর হয়ে গেলাম। কিন্তু মন গলে পাথরের গহ্বরে। মনোহরার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারি না। এর মধ্যেই যেন তার চোখের কোলে কালি পড়েছে। চিহ্ন নেই, অথচ আঘাতে ভরা মুখ, 'কী বলতে চাও জানি। সংসারে কি সকলের সব কিছু পেতে আছে? চাইলে মেলে কী?' জবাব দিতে পারলাম না। মনোহরা দু' হাত ছড়িয়ে, নিজেকে দেখালো, 'এই আমার মধ্যে আমি আছি। অনেক মার তো খেয়েছি। এখন চিকিৎসে হচ্ছে। আমার যা পাওয়ানা নেই, তা ধরতে আমি ছুটব না।'

বন্দী এখন ক্ষ্যাপা। এটা ভালো না। কিন্তু কথা শোনে না। বললাম, 'তবে আপনি এখানে কেন?'

'কোথায় যাব? তুমি নিয়ে যাবে?' মনোহরার শুকনো ঠোঁটে বাঁকা হাসি।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'সংসার তো আপনার জন্য হাত বাড়িয়ে আছে। আমি কেন?'

'কোন্ সংসার?' মনোহরার চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠলো।

আমার মুখে সহসা কথা ফুটলো না। মনোহরা রুদ্ধস্বরে বললো, 'বল।'

বললাম, 'মাফ করবেন, আপনাকে দুঃখ দিতে চাই না। কিন্তু সংসারেও কতো শ্রী। আপনার নাম তো দুর্গা।'

'তা হলে এবার শিবকে ডাক, দাঁড়ি খানেক বিয়োই।' মনোহরার স্বরে তীব্র বিদ্রূপ, 'আঁচলে চাবি ঝুলিয়ে, দাপিয়ে সংসার করি!' বলতে বলতে সে দরজায় কাছে, 'শুয়ে পড় বাবাজী।' সে দরজা টেনে দিয়ে চলে গেল।

নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এ কেবল ভর্ৎসনা না। মনোহরা আমার মুখের ওপর দরজা টেনে দিয়ে গেল। সহজ করেই কথাটা বলতে গিয়েছিলাম। বুঝতে পারিনি, আঘাতটা কোথায় লেগেছে। এখন নিজেকেও অপমানিত মনে হচ্ছে। শেষ রাত্রির, শেষ বিদায়টা গ্লানিতে ভরে গেল। বোধহয় অধিকার বোধটাকে ভুল করেছিলাম। কিন্তু অপমানই বা ভাবছি কেন? আমি তো মনোহরার কাছে নিজেকে অস্পষ্ট রাখিনি। তঞ্চকের ভান নেই। ছলনার আশ্রয় নিইনি। তবে থাপ্পড় খেয়েও মুখে হাসি ফোটে। আমি তেমনি হেসে পুবের জানালার কাছে গেলাম। মনোহরাকে ভুলতে পারব না। রাত পোহালে চলে যাব। হয়তো দেখা হবে না। ক্ষমাও চাইব না আর মনে মনে। জীবনে সেও একটা দান দিয়ে গেল। ঝোলায় রাখি।

রাত্রে ভালো ঘুমোতে পারলাম না। স্বাভাবিক। তবু শেষ রাত্রে মধুমাসের বাতাসের নেশা লেগে গেল। চোখ মেলে দেখি, জানালায় গাছের ফাঁকে রক্তিম রোদ। প্রায় লাফ দিয়ে উঠলাম। হিসাবটা আগেই ছিল। গুপ্তিপাড়ার দূরত্বকে হেঁটে সামিল করা যাবে না। সেই আবার বলাগড় ইস্টিশন। পা চালিয়ে গেলে, প্রথম রেলটা পেতে পারি। হাতে মুখে জলের ঝাপটা, পথেই হবে। জলাশয়ের অভাব নেই। ঝটিতি জামাকাপড় বদলে নিলাম। বিন্যস্ত হবার কিছু নেই। ঝোলা কাঁধে করলাম।

দরজায় মনোহরা এসে দাঁড়ালো। স্নান শেষ। ঘোমটা নেই। ভেজা চুলে ঝরে পড়া জলের কণায় হীরা জ্যোতি। যোগিনী বেশ। মুখ শীর্ণ, চোখের কোল বসা। ঠোঁটে হাসি, 'ভাবছিলাম ঠিক, চোরটা এ ভাবেই পালাবে। তবু ধরা পড়ে গেলে।'

আমার মান অপমান অভিমান, কিছু নেই। দুঃখ যেটা, মনোহরার মনোকষ্ট। তা দূর করে যাবার কথা একবারও ভাবিনি। কারণ, যা যায় না, তা যায় না। তাকে আমার যেখানে রাখবার রেখেছি। হেসে বললাম, 'কলকাতার প্রথম গাড়িটা ধরতে চাই।'

'কলকাতায় ফিরে যাচ্ছ?' মনোহরার চোখে ভ্রূকুটি বিস্ময়।

বললাম, 'না। কলকাতা থেকে যে-গাড়িটা আসছে, সেটার কথা বলছি।'

'তার জন্য কি হাতে মুখে জল দেবারও সময় নেই?'

'দেরি হয়ে যাবে। আরো আগে উঠতে পারলে ভালো হতো। পারলাম না।'

'রাগ করেছ?' মনোহরার স্থির দৃষ্টি আমার চোখে।

বললাম, 'আপনার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবো না। দেখুন।'

মনোহরা এগিয়ে এলো কাছে। যেন সত্যি দেখবার জন্যই, তাকালো আমার মুখের দিকে। তারপরে হঠাৎ তার সেই হাসি, যা মুখে হাত চাপা দিয়ে রুখতে হয়, 'দেখলে তো, আসলে আমি একটা মেয়ে। আর কিছুই নই। কথাটা তো মিছে বলিনি। কিন্তু এখানে যে দরজা বন্ধ। এ জীবনে আর বেরতে পারব না।' নিজের বুকে হাত রাখলো। ভেজা চুলের জলের কণা কি তার চোখের কোণে টলটলায়?

মনোহরার হাসি দেখে, আমার মনটা ধুয়ে গেল। রাত্রে যে গ্লানিটা বোধ করেছিলাম, তার ছিটেফোঁটাও নেই। সে যে একটি মেয়ে, স্বীকারোক্তিটা বড় সরল। জানি, সে তার অধিক কিছু। অন্যথায় এমন করে চোর ধরতে আসতো না। বললাম, 'তবু, দুঃখ দিয়েছি।'

'না' মনোহরা মাথা নাড়লো, 'ঘা মেরেছ। বড় আচমকা। জেনেশুনে অমন করে মারতে আছে?'

বলতে পারি না, জেনে শুনে মারিনি। ভিতর থেকে মারটা ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। রূপ দেখে ফিরি। সে রূপটা সংসার ছাড়া না। সংসারের রূপটাই, এমন মূর্তি ধরে বেরিয়ে এসেছিল, মনোহরার কাছে সেটা মারমূর্তি। তাকে আমি আপনি ছাড়া বলিনি। সে আমাকে বলতেও বলেনি। এটা তার চরিত্রের একটা লক্ষণ। সে আমার থেকে বয়সে বড় কিংবা ছোট, জানি না। কথা শুনে ইচ্ছা করলো, তার মাথায় একটু হাত রাখি। পারলাম না। বরং যে দুঃখ সে মনের স্বস্তিতে বয়ে বেড়াচ্ছে, সেটাকে করুণা করার সাহস যেন না করি। সামনে মাথাটা পেতে দিয়ে বললাম, 'যেমন খুশি শোধ নিন।'

'তা পারছি কোথায় বল।' মনোহরা চোখের তারায় ঝিলিক দিয়ে হাসলো, 'এ শোধ হাতে মেরে, পাতে মেরে হয় না। তোমাকে রক্তগঙ্গা করলেও হয় না। তবে একটা শোধ নেব। যেচে এসেছ, ধরতে পারলাম না। নিজের হাতেই শোধ দিয়ে যাও।'

বললাম, 'বলুন কী শোধ দেবো?'

'যেমনি করে এসেছিলে, আবার তেমনি করে এস। দেবে এই শোধ?' মনোহরা ঘাড় ঝাঁকিয়ে আরও সামনে এসে দাঁড়ালো।

তার ভেজা চুলের জলের ছিটা লাগলো আমার গায়ে মুখে। শান্তিবারির মতো। মনে পড়লো তার সেই খত্ দেবার কথা। সে আবার বললো, 'আমার জীবনটা

কেমন, দেখলে তো। তুমি, আর যাঁর কথায় এখানে, তাদের মত লোকেরা এলে মনটা ভাল থাকে।'

হেসে বললাম, 'মিছে কথা ভারি খারাপ।'

'আমার কথাই আমাকে?' মনোহরা ঠোঁটে ঠোঁট টিপে চোখ পাকালো। পরমুহূর্তেই হেসে আমার এলো চুলে তার ঠাণ্ডা হাত ঘষে দিল, 'মিছে কথা দেবার চেয়ে এই কথা ভাল। তবু বলে রাখি, তুমি রূপখোর। নেশা তো একটাই। বড় খারাপ নেশা। এ নেশার অনেক রঙ। একটাতে মৌতাত মজে না। যদি মনে থাকে, ইচ্ছে করে, আবার এস।'

বললাম, 'যেন আসতে পারি। আমার যে এ তিন রাত্রি—।'

মুখে হাত চাপা পড়ে গেল। একটা ত্রস্ত ব্যগ্রতা মনোহরার স্বরে, 'বলো না। ওই ভয়ে তোমাকে একবারও জিজ্ঞেস করিনি, কেমন লাগল। আমি তোমার কতটুকু জানি? কিছুই না। তুমি একবার মাত্র বলেছ, লেখ। তাইতে একটা আন্দাজ করতে পারি।' সে আমার মুখ থেকে হাত নামিয়ে বুকে রাখলো, 'আমার এখানটা একেবারে পাথর নয়। হয় তো মনে থাকবে। আর একটা দেখলাম, তুমি জোরে বল না।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কী?'

'যারা লেখাপড়া করে, শহরে থাকে, তারা বড্ড জোরে বলে।' মনোহরা শব্দ করে হাসলো, 'এত জোরে বলে, কারুকে দাঁড়াতে দিতে চায় না।'

মনোহরার চোখের কালো গভীরে তাকিয়ে কথাটার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করি। তারপরে হঠাৎ হেসে উঠি। বলি, 'আমি তেমন শহরবাসী নই। তেমন লেখাপড়ার লোকও নই। আমি কারোকে কিছু শেখাতে আসিনি, জোর থাকবে কেমন করে?' হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালাম।

'ঘড়ি দেখো না।' হাতটা সরিয়ে দিল, 'নিতাই বাবাজী বাইরে আছে। সে তোমার সঙ্গে ইস্টিশনে যাবে। এখন কোথায় যাবে, সে কথা ভুলেও জিজ্ঞেস করব না। কিন্তু যাবার আগে আর কিছু বলে যাবে না?'

মনে কথাটা এসেছিল। উচ্চারণ করলাম, 'ব্রজর কথা জানবার ইচ্ছেটা মন থেকে যাচ্ছে না।'

'বিশ্বাস করবে?' মনোহরার চোখে উপচে পড়া বিস্ময়, 'ভাবছিলাম, কথাটা তুমি কি একবারে ভুলে গেছ? ওর বিসর্জনের কথাটা তোমাকে জানাব কেমন করে?'

মনটা ভার হয়ে এলো। বললাম, 'বিসর্জনেই যাবে, এমন বলছেন কেন?'

'বলেছি, ওকে আমি বিসর্জন দিয়েছি।' মনোহরার চোখে উদ্বেগ, 'তুমি কত কি দেখেছ। আমিও যে দেখছি। ব্রজ বিসর্জনে যাবে। কী মূর্তি নিয়ে যাবে, তাই ভেবে গায়ে কাঁটা দেয়। অন্ততঃ ব্রজর খোঁজেই একবার এস।'

মনোহরার কথার পরে, আর ব্রজর জন্য আসবার দরকার নেই। আমি লোকসমাজের যুক্তি বিচারে একটা সামান্য কথা বলেছিলাম। মনোহরাকে তা আঘাত

করেছে। তার দৃষ্টি কতো দূরে, কতো সজাগ তার সহজ মন, সেটাও ভাবা উচিত ছিল। আমি সমাজ সচেতন? মানুষকে ফেরাবো তার আপন সত্তা থেকে। যে সত্তার গভীর আমার অনুমানের বাইরে। আমি তার চোখের দিকে তাকালাম। মনোহরা জিজ্ঞেস করলো, 'কী?'

বললাম, 'বলি বটে রূপের ফেরে ফিরি। আসলে ফেলে আসা জগৎটা ছাড়ে না, তাই কাকে কী বলতে হয়, সব সময়ে ঠিক করতে পারি না। আপনাকে আমার কাল রাত্রে শেষ কথাটা বলা ঠিক হয়নি।'

'আবার সেই কথা কেন?' মনোহরা মুখ তুলে তাকালো। চোখে করুণ ব্যগ্রতা, 'তোমাকে তো বললাম, আমি একটা মেয়ে। নইলে তোমার ওপর অমন করে রেগে যেতাম? চোট খেতাম? সারা রাত্রি কাঁদিয়ে এখন আর এসব থাক।'

তাই থাকবে। ব্রজর কথা উঠলো বলেই, মনোহরার চরিত্রের অন্য দিকটা নতুন করে চোখে পড়লো। তার মুখ থেকে চোখ নামিয়ে, পায়ের দিকে তাকালাম। সে আমার চিবুকে হাত দিয়ে মুখ তুলে ধরলো, 'এস।'

ঠিক এমনি করে বিদায় চাইনি। তার পায়ের দিকে যে কেবল শ্রদ্ধা করে তাকিয়েছি, তা না। আমার রূপের প্রাণটা পুরুষের। বন্ধু বিদায় কি এমনি করে হয়? বললাম, 'একবার। ক্ষতি কী?'

'সত্যি বলছ?' মনোহরার স্বর রুদ্ধ হয়ে এলো।

বললাম, 'মিছে কথা ভারি খারাপ।'

'তবে এস।' মনোহরা আমার মাথার চুল ধরে নামিয়ে দিল তার পায়ের কাছে।

আমি নত হয়ে মনোহরার পা স্পর্শ করলাম। শীতল পা দুটিতে হাত দিয়ে, সেই মুহূর্তে আমার সকল যুক্তি বুদ্ধি বাস্তবতা, সেই উপলব্ধিতেই পৌঁছে দিল। নারী শক্তিস্বরূপিনী। ত্রিভুবনধারা। দেহস্বরূপিনী। তুমি তপ, জপ। তুমি জননী, তুমিই সখি। তুমি প্রেম, তুমি ইষ্ট। মাথা তুলে দাঁড়ালাম। মনোহরা স্থির অচঞ্চল। দুই চোখ বোজা। ধ্যানস্থ মূর্তি। কিন্তু চোখের দুই কোণে টলটলে মুক্তা বিন্দু। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত।

খোলা দরজার দিকে চোখ পড়লো। নিতাই ভামিনী তিলকা তিলকার মা, অনেকেই দাঁড়িয়ে রয়েছে দাওয়ার ওপর। সম্ভবত তারা আমার নমস্কারের ঘটনাটি দেখেছে। তাদের চোখের বিস্ময়ে যেন অলৌকিকতা। কেমন একটা আড়ষ্টতা বোধ করলাম। কিঞ্চিৎ লজ্জাও। সংসারের চোখে হয় তো এ এক দৈব নাটকীয়তা। কিন্তু আমার ভিতরটা ধুয়ে সাফ সুরত্। দূরের আকাশে উড়ে যাওয়ার খুশি স্পন্দন আমার ডানায়। উচ্চারণ করলাম, 'যাই।'

মনোহরা নিশ্চল। চোখ খুললো না। ঠোঁট কাঁপলো না। একটা কথা বললো না। চোখের কোণের মুক্তা বিন্দু গলে পড়লো। আমার মাথা টেনে নামিয়ে দিয়ে সে বিদায় জানিয়ে দিয়েছে। আর তার কিছু বলার নেই। আমি ঘরের বাইরে এলাম।

সবাই আমার পথ ছেড়ে দাঁড়ালো। পুবের ঘরের দাওয়ায় বসেছিলেন গোলকদাস গোঁসাই। গড়গড়ার নল গড়াগড়ি যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, প্রাতঃকৃত্যাদির পূর্বে তামাকু সেবন হচ্ছিল। তাঁর চোখেও দেখছি একটা বিস্ময়ের ঘোর। কাছে গিয়ে হাত জোড় করে নত হলাম, 'যাচ্ছি।'

'তা তো যাচ্ছ বাবাজী। আমার আখড়া মজিয়ে গেলে।' গোলকদাসের ম্লান হাসিতে এই প্রথম বিষয়ী ব্যক্তি অনুপস্থিত, 'আবার কবে আসা হচ্ছে?'

অনায়াসেই বললাম, 'সুযোগ পেলেই আসবো।' এখানে কেন যেন, 'মিছে কথা ভারি খারাপ' ধ্যানে এলো না। তার পায়ে হাত দিতে পারলাম না। আমার অন্তর্যামী দায়ী। ফিরে সকলের কাছে জোড় হাতে বিদায় নিলাম। উঠোনে অনেকে দাঁড়িয়েছিল। সেই রাধা কৃষ্ণরূপী বালক বালিকারাও। স্বয়ং গন্ধবাবা। তার নামের পরিচয়টা পরে জেনেছি। জাঁকটা তার একেবারে মিথ্যা না। আখড়ার সে প্রধান পাচক। নিরামিষ রান্না সে সত্যিই গন্ধেই ভোজন করিয়ে দিতে পারে।

এখন কৃষ্ণকলির ঝাড় শুকনো। মাধবী লতা বাতাসে দুলছে। তলায় ঝরে পড়ে আছে, নিজেকে নিঃশেষ করা গত রাত্রের অবশিষ্ট নিয়ে। বাতাস বড় এলোমেলো। কচি আমের গন্ধ ছড়াচ্ছে। আমি চোখ তুলে ভামিনীকে খুঁজলাম। সে সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল কাছেই। আমার গোনা গুনতি কড়ির হিসাব ছিল। হাতে রেখেছিলাম যৎসামান্য। ভামিনীর সামনে গিয়ে, হাত বাড়িয়ে দিলাম, 'রাধামাধবের সেবায় দেবেন।'

'আমাকে কেন বাবাজী?' ভামিনীর টানা চোখে বিস্ময়ের চমক, 'মনোহরাকে দিলেন না কেন?'

বললাম, 'একই তো কথা। আপনি রাখুন।'

ভামিনী মুখ ফিরিয়ে তাকালো গোলকদাস গোঁসাইয়ের দিকে। গোলকদাস হেসে বললেন, 'মাথা পেতে নাও গো।'

ভামিনী হাত বাড়ালো। তার হাতে আমার যেটুকু সঙ্গতি তুলে দিলাম। দক্ষিণের ঘরের দরজা খোলা। মনোহরাকে দেখতে পাচ্ছি না। বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। নিতাই আমার সঙ্গে।

বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের মুখটা মনে পড়ছে। ডুমুরদহ থেকে হেঁটে গুপ্তিপাড়া যাবার কথা শুনে তাঁর আক্কেল গুড়ুম হয়েছিল। তার চেয়ে আমার আক্কেলে তিন গুড়ুম। রেল লাইনের হিসাবেই, বলাগড় থেকে গুপ্তিপাড়া ষোল মাইল। রূপের নেশায় মাতাল হওয়া ভালো। অন্ধ হওয়া না। হাঁটা পথের আঁকাবাঁকায় আরও কোন্ না দু চার মাইল বাড়তো।

গাড়িটা পেয়েছিলাম। দৌড়ুতে হয়েছিল। তবে সেটা প্রথম গাড়ি না। দ্বিতীয় প্রথমটা

আরও আগে। টিকিট কাটতে হিমসিম। অন্য কারণে না। টিকেটদাতা মানুষটির চাল বড় গদাইলস্করি। নিতাই পথে আসতে অনেক কথা বলেছে। সব কথার আগে পিছে তিলকা। শুনেছি, বলিনি কিছুই। মনোহরার মন্তব্য আমার মনে ছিল। গাড়ি ধরবার আগে, তাকে একটি টাকা দিতে যেতেই, সে সাপ দেখার মতো সরে গিয়েছিল। বলেছিলাম, 'আমার নাম করে, একটু দম দেবেন। ওতেই আমি নিতাই ভোম্ হয়ে যাবো।'

নিতাইয়ের কী হাসি! ভোলবার না। কিন্তু তার শেষ কথাটি চিরদিনের। গাড়ি ঢুকছে ইস্টিশনে। সে আমার কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিল, 'বাবাজী মনোহরা দিদির মধ্যে আপনার দর্শন হয়েছে?'

দেখেছিলাম, নিতাইয়ের চোখে অলৌকিক ব্যাকুলতা। নিতাইয়ের 'দর্শন' বুঝি। সে দর্শনে আমার বিশ্বাস নেই। নিতাইকে তা বোঝাবার সময় মন কোনোটাই ছিল না। বলেছিলাম, 'হয়েছে।'

গুপ্তিপাড়ায় এসে, পথ ঠিক করা ছিল। গত মাঘে যে-পথে ফিরেছিলাম, সেই পথেই হাঁটা গ্রামের ভিতর দিয়ে, গন্তব্য অনেক ঘোরা পথ। উত্তর-পুবে মুখ করে চলো। গ্রাম থাকবে দক্ষিণে। শ্রীপুর সুখড়িয়ার থেকে কোনো অংশে কম না। বরং দেব দেউলে, নানা মহোৎসবে গুপ্তিপাড়ার টান দেশ দেশান্তরে।

মনে নানা সংশয় ছিল। এমন করে আসবার কথা না। আজ একাদশী। কাল দ্বাদশীতে চৈত্র সংক্রান্তি। গাজনের সন্ন্যাসীর দেখা সবখানে। আমার গন্তব্য গুপ্তিপাড়া কালনার মধ্যবর্তী স্থানে। হুগলির শেষ, বর্ধমানের শুরু। শ্যামাক্ষ্যাপার আশ্রমে। গত মাঘে তাঁর সঙ্গেই ত্রিবেণী থেকে নৌকোয় এসেছিলাম। প্রতি পূর্ণিমাতেই প্রায় ত্রিবেণীতে গমন করেন। নৌকোযোগে। সঙ্গে থাকে কিছু পালিতা পুত্র কন্যা। তিনি সিদ্ধপুরুষ। সেটা পরে জেনেছি। তবে সিদ্ধ অসিদ্ধ আমার জ্ঞানের বাইরে। ত্রিবেণীর ঘাটে একটা আক্কেল সেলামী দিতে হয়েছিল। দেহোপজীবিনীদের সঙ্গে এক দেহোপজীবিনীর শববাহী হয়েছিলাম। স্নান করতে গিয়ে দেখেছিলাম, ঘাটে নৌকো বাঁধা। নৌকোর সাজগোজ ভালো। সাধক একজন বসে, হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলেন। মাথায় তাঁর ধূসর রঙের বড় বড় চুল পিঠে ছড়ানো। উচ্চনাসা, উজ্জ্বল টানা চোখ। শক্ত সমর্থ দীর্ঘ শরীর। হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলেন তন্ময় হয়ে। সেরকম বাজনা কলকাতার নামকরা বাজনদারের হাতেও আওয়াজ দেয় কিনা সন্দেহ। মুগ্ধ হয়েছিলাম। মন্দিরা বাজাচ্ছিল এক তরুণ। তার গায়েও গেরুয়া। শ্যামাক্ষ্যাপার কপালে লাল ফোঁটা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কিন্তু তন্ময় সাধক বাদক তাঁর ভুরু নাচিয়ে আমাকে যেন কী ইশারা করছিলেন। আর হাসছিলেন। অন্য দিকে আধুনিকা বালা। ফরসা রূপসী বলা যায়। নীল শাড়ি লাল জামা। শাড়ি পরার ধরনটা বেশ কায়দাদুরস্থ শহুরে। খোলা চুল পিঠে ছড়ানো।

শ্যামাক্ষ্যাপা আমাকে টেনে নিয়ে এসেছিলেন এখানে, তাঁর আশ্রমে। পরিচয়ে

জেনেছিলাম, পুত্র কন্যারা সব পথ থেকে কুড়ানো। কিন্তু পরিচয়, সব তাঁর নিজের ছেলেমেয়ে। সকলের নাম তাঁর নিজের দেওয়া। নৌকোয় দেখেছিলাম দুজনকে। গঙ্গা আর যমুনা। রূপ দেখেই নাম স্থির। আশ্রম শাখা করেছেন আরও কয়েক জায়গায়। নিজেকে মহৎ করার চেষ্টা দেখিনি। মেয়েদের ঠিক মতো মানুষ করে, সৎপাত্রে দান। ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা। তার মধ্যে, তাঁর মনের মতো কোনো কোনো ছেলেকে, বিভিন্ন জেলায় আশ্রমের দায়িত্ব দিয়েছেন।

কেমন করে আমাকে তাঁর নৌকোয় তুলেছিলেন, ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে খবর আছে মুক্ত বেণীর উজান যাত্রায়। তিনি নিজে সাধক পরিচয়ে আমাকে টানেন নি। বেশ্যার শববাহীকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। তাঁকে প্রথম দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বাজনায় হাতের জাদু দেখে। তারপরে হাট করে খোলা এক প্রসন্ন প্রাণের আশ্রয়। গঙ্গা যমুনার স্বরে গানের জাদু! বিশেষ, শক্তিতন্ত্রের। কেবল সেই গানের সময় তাঁর দু চোখের কূলে জল গলে। দাড়ি গোঁফের ভাঁজে ভাঁজে হাসি। খবর ছিল মাঘেই, যমুনার বিয়ে একরকম স্থির। শ্যামাক্ষ্যাপার এক ভক্ত, কলকাতার ডাক্তারের সঙ্গে। গোলমাল গঙ্গাকে নিয়ে। বিদায়ের দিন ভোরে, গঙ্গা আমাকে সেই নিষিদ্ধ স্থান দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। নিষিদ্ধ, কারণ শ্যামাক্ষ্যাপা চান না সেই স্থান দর্শনের কোনো প্রচার মহিমা। গঙ্গা তাঁর অনুমতি নিয়ে আমাকে দেখিয়েছিল। লোহার শিকে ঘেরা, পঞ্চমুণ্ডির আসন। তখন গঙ্গা ব্যক্ত করেছিল, ও না আছে ঘাটে। না বাইরে। আশ্রমেব বাইরে বিবাহিত জীবনের কল্পনা ওকে ভয়ে শিহরিতা করে। অথচ ওর সমস্ত প্রাণ, রমণী স্বভাবে বিকশিত হতে চায়। শুনে আমার নিজের মনেই গভীর উৎকণ্ঠা জেগেছিল। কেন যেন কপালকুণ্ডলার কথা মনে পড়েছিল। অথচ জানতাম, শ্যামাক্ষ্যাপা কাপালিক নন। তিনি আর কোনোরকম ধর্মাচরণই করেন না। কেবল সাপ নিয়ে খেলা করেন। হারমোনিয়াম বাজান, মন্দিরার তালে। আর সজাগ দৃষ্টি তার ছেলে মেয়েদের সম্পত্তির দিকে। বুঝেছিলাম, তিনি এক নিরালা আশ্রমে বসে, অনেককে আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। ভাগ্যবানের বোঝা বইবার জন্য, ভগবান বলে কেউ আছেন কি না, তার হদিশ পাইনি। তাঁর কর্তব্যের দয়া নিতে অনেকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, সেটা বুঝেছি।

কিন্তু তাঁকে নিয়ে নানা রহস্য কাহিনী। তিনি কালীর সেবক ডাকাত। তিনি ডাকাতের দল পোষেন। লুটপাট করেন। সুন্দরী মেয়েদের আশ্রমে রাখেন। সবই অবিশ্যি তাঁর মুখ থেকে শোনা। কিছুটা ত্রিবেণীতে গৌরহরি চক্রবর্তীর কাছে। তবে গৌরহরিরও সবই শোনা। চোখে দেখেননি কিছুই। বরং গৌরহরি চক্রবর্তী আমাকে শ্যামাক্ষ্যাপার আমন্ত্রণ নিতে অনুরোধ করেছিলেন।

ইস্টিশন থেকে তিন মাইলের ওপর পথ। শ্যামাক্ষ্যাপার স্থানীয় নাম ক্ষ্যাপাবাবা। ক্ষ্যাপা তো বটেই। তবে রক্তচক্ষু উগ্র না। বজ্র হুংকার ব্যোম্ ব্যোম্ নেই। অট্টহাসি

আর গান। কেবল একটা বিষয়ে আমার গায়ে কাঁটা। উনি সব সময়েই প্রায় সাপ জড়িয়ে থাকেন। সে সাপের বিষ আছে কি না জানি না। রাজ সাপ সন্দেহ নেই। দুরন্ত তার ফণা, ফোঁস শুনলে বুক হিম।

আশ্রমের পাঁচিলের ধার ঘুরে, দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। গাছপালায় নিবিড় ছায়া। ইঁট পাতা রাস্তা। বাগানের একপাশে কয়েকটি ঘর। মূল মন্দির বাড়ি আলাদা। ভিতরে মন্দির সংলগ্ন উঁচু নাটঘর। নাটঘরের নিচে দু পাশে ঘর। একপাশে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সামনে আর একটা বাগান। আশ্রমের ছেলেমেয়েদের বাসস্থান আলাদা। সেদিকেও বাগান, আর বড় একটা পুকুর। পানীয় জলের জন্য দুটো টিউবওয়েল আছে। কুয়ো আছে একটা। মন্দিরকে মাঝখানে রেখে, একদিকে মেয়েদের বাসস্থান। বিপরীত দিকে ছেলেদের। ছেলেমেয়ে ছাড়াও, বয়স্ক মেয়ে পুরুষের সংখ্যা ডজন খানেক বটে।

মন্দিরের প্রকোষ্ঠে চতুর্ভুজা কালী। ক্ষ্যাপাবাবা থাকেন নাটমন্দিরের উত্তরের একটা ঘরে। ছোট ছেলেমেয়েরা এখন নিশ্চয়ই ইস্কুলে। মানুষ কম নেই। কিন্তু কোলাহল নেই। অথচ ভিতরে চলছে যজ্ঞকাণ্ড। সমস্ত আশ্রম পরিষ্কার রাখা, ধোয়া মোছা। রান্নাবান্না, জল তোলা। গতবারে দেখে গিয়েছি, গঙ্গা যমুনা প্রায় ক্ষ্যাপাবাবার পাশে পাশে। প্রীতি আর বকুল ছাড়া রতন আর ধীরেন মন্দিরের কাজে বেশি ব্যস্ত। রতন বোধহয় বেশি প্রিয়। কারণ সে হারমোনিয়ামের সঙ্গে মন্দিরা বাজায়। বাবার দাড়ি চুলে জড়িয়ে গেলে, কাল কালী গোখরাকে টেনে নামায়। আবার গঙ্গা যমুনা বেশি পাশ ঘেঁষে বসলে, কপট বিরক্তিতে বলে ওঠে, 'যা না, একটু কাছ ছাড়া হ দেকিনি। ডাকিনী যোগিনীগুলো জ্বালিয়ে খেলে।'

গঙ্গা যমুনার অমনি মুখ ভার। শ্যামাক্ষ্যাপা জিভ কেটে নিজেই তখন কালী। বলেন, 'ব্যাটা, মা'কে গালি দেয়? জিভ কেটে দে।' আবার টেনে নিয়ে আদর করেন।

মূল মন্দির বাড়ির দরজা খোলা। চৈত্রের বাতাসে একটা নিঝুমতা। কিন্তু থেমে নেই কেবল বিহঙ্গকুল। তার মধ্যে সেই কালামুখোর কুউ-উ-উ। হাতের ঘড়িতে দেখছি বেলা বারোটার কাছাকাছি। একটা মৃদু গলার গুনগুনানি কানে আসছে। শুনে ধ্যান, রমণীর। আরও কয়েক পা এগিয়ে, সামনে নাটমন্দির। প্রথমেই চোখে পড়লো শ্যামাক্ষ্যাপাকে। বসে আছেন থামের গায়ে হেলান দিয়ে। খোলা চুলের বাঁ কানের পাশে, সাপের জিভ লকলক করছে। সামনে কয়েকজন মেয়ে পুরুষ। অচেনা মনে হলো। রতন বসে আছে মন্দিরের দিকে ফিরে। তার অদূরে বকুল।

ক্ষ্যাপাবাবা সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন। চোখে অন্যমনস্কতা। আমি ভাবলাম, আমাকে দেখছেন। কিন্তু তা না। আপন মনে আছেন। সরীসৃপ বাহনটি কী করছে? কান খুঁচিয়ে দিচ্ছে নাকি? আমি নাটমন্দিরের পুবদিক ঘুরে, দক্ষিণে সিঁড়ির কাছে গেলাম। আসবার কথা না। তবে যাত্রাটা এবার এদিকেই। একবার না এসে থাকতে পারলাম না। কী ভাবলেন, কে জানে? নিচে স্যাণ্ডেল খুলে রেখে, ওপরে উঠলাম।

সকলেই প্রায় ফিরে তাকালো। রতন আর বকুলের চোখ খুশিতে ঝলক দিল। কিছু বলবার আগে ক্ষ্যাপাবাবার দিকে তাকালো।

ক্ষ্যাপাবাবার কানের কাছ থেকে বাহনের মুখ সরিয়ে, রতনের দিকে ফিরলেন, 'হ্যাঁরে রতন, আমরা তো কারোকে বশীকরণের মাদুলি কবচ দিই না। দিই?'

'না বাবা।' রতন হেসে মাথা নাড়লো।

সামনে যারা কয়েকজন বসেছিল, তারা অবাক চোখে ক্ষ্যাপাবাবার দিকে তাকালো। ক্ষ্যাপাবাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'মন্ত্রপড়া মায়া ডোর চোখের কাজল সাপের এঁটুলি শেয়ালের নখ এসব দিয়ে কারোকে তুক করি কি আমরা?'

'না তো বাবা।' রতন মাথা নাড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

বকুল জোরে হেসে উঠতে গিয়ে মুখে আঁচল চাপা দিল। বাকিরা ক্ষ্যাপাবাবার মুখোমুখি। পিছনে আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। অবাক চোখে বাবাকে দেখছে। বাবা চুলে জড়ানো বাহনটিকে টেনে কোলের ওপর নামিয়ে দিলেন। হাত দিয়ে আমাকে ইশারায় দেখালেন। মুখ ফেরালেন না। জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে কিসের টান? এ যে আমাকেও ধোঁকা লাগিয়ে দিল?'

একটা কৌতুকের ছটা আমার মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছিল। প্রথমে হঠাৎ বুঝতে পারিনি। ক্ষ্যাপাবাবার কথাগুলোর উপলক্ষ আমি। দেখতে পেয়েছেন ঠিক। দৃষ্টি আসলে অন্যমনস্ক ছিল না। রতন আর বকুলের হাসিও সেটা জানিয়ে দিচ্ছিল। বললাম, 'কাছে যেতে পারছি না।'

ক্ষ্যাপাবাবা থামের হেলান ছেড়ে সোজা হলেন। ফিরে তাকালেন আমার দিকে। চোখের তারায় গোঁফ-দাড়িতে হাসির কী বাহার, 'তাই তো বলি, অ্যাঁ? তুমি তো ধর্মে নেই, টানে আছ। এস বাবা আমার।' দু হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'ও তোমার কিছু করবে না।'

এগিয়ে গিয়ে কাঁধের ঝোলাটা নামালাম। বাহনটিকে ভয় আছে। মনে জানি, আসলে বিপদ কিছু নেই। কাছে গিয়ে নিচু হতেই, দু হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেন। তাঁর দেহের শক্তি আমার থেকে এখনও বেশি। একেবারে বুকে গিয়ে পড়লাম। বাহনটি ফোঁস করে উঠে, মূল মন্দিরের বন্ধ দরজার কাছে চলে গেল। পায়ে হাত দেবার অবকাশ পেলাম না। দু হাতে আমার মুখ তুলে দেখলেন, 'শুকনো দেখি কেন? কলকাতা থেকে?'

বললাম, 'না, শ্রীপুর—মানে বলাগড় থেকে। এখনো চোখ মুখ ধোয়া হয়নি।'

'ওলো বকুল, ও রতন, শোন।' ক্ষ্যাপাবাবা ব্যস্ত স্বরে বললেন, 'যা, নিয়ে যা। আগে হাত মুখ ধুয়ে নিক। একটু কিছু দে। তাই ভাবি, মুখখানি এত শুকনো দেখায় কেন? অধার্মিক বাবা আমার, খবর সব ভালো তো?'

বললাম, 'ভালো।'

রতন আমার ঝোলাটা তুলে নিল, 'আসুন।'

ক্ষ্যাপাবাবা আমাকে ঠেলে তুলে দিলেন, 'মুখ ধুয়ে একটু কিছু খেয়ে এস। তারপরে কথা হবে। তবে তার আগে একটা কথা।' বলে হাতছানি দিলেন, নিচু স্বরে বললেন, 'দেখে বড় ভাল লাগল।'

আমার মনটা ভরে যাচ্ছে। যেটুকু বা সংশয় ছিল, তার ছিটেফোঁটা নেই। রতন উত্তরের বাবার ঘরের পাশের ঘরে গেল। মাঘ মাসে আমাকে ঐ ঘরেই থাকতে দেওয়া হয়েছিল। বকুলকে দেখতে পেলাম না। আমি রতনের সঙ্গে ঘরে ঢুকলাম। রতন জিজ্ঞেস করলো, 'এত বেলা অবধি মুখ ধোয়া হয়নি? চাও খাননি নাকি?'

সত্যি, এটা নিজেরও খেয়াল ছিল না যেন। শ্রীপুরের বিদায়টা এমনই ঘটনা, তার রেশটা এখনও কাটেনি। বললাম, 'সকাল থেকে কিছুই হয়নি।'

'ছি ছি। শ্রীপুরে কোথায় ছিলেন?'

'বলবো।' কাঁধ ঝোলা থেকে আগে দাঁতমাজা ব্রাশ পেস্ট গামছা বের করলাম। পিছনের দরজা খুলে, চেনা পথে চলে গেলাম। নাটমন্দিরের মাঝ বরাবর, ভিতর দিকে টিউবওয়েল আর কুয়ো পায়খানা। সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

বেলা বারোটায় প্রাতঃকৃত্য সারতে হলো। রতন আমার কাছ ছাড়েনি। বললো, 'একেবারে স্নানটা সেরে ফেললেই হতো?'

বললাম, 'এতো সকালের কাজ হলো। আজ দুপুর হতে দেরি হবে।'

ঘরে ফিরে দেখি, গঙ্গা জানালার ধারে বসে আছে। স্নানের শেষে, চুলের দু পাশে দুটি আলগা বিনুনি করা। আটপৌরে ধরনের শাড়ি পরা। কপালে একটি লাল টিপ। সকালের পূজার পরে পরেছে। ফরসা প্রায় দোহারা গঠন শরীরে কোনো পরিবর্তন নেই। দু মাঘে আর কতটুকুই বা পরিবর্তন হতে পারে। তবে নীল শাড়ি লাল জামা ওর ভারি পছন্দ দেখছি। গালে হাত দিয়ে বসেছিল। ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকালো। ঠোঁটে চোখে প্রীতিপূর্ণ হাসি, 'বকুলটাকে মারতে যাচ্ছিলাম।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

'রান্নাবান্নার কথা হচ্ছে, তার মধ্যে গিয়ে বলে আপনি এসেছেন। বিশ্বাস হয়?' গঙ্গার মুখে হাসি। স্বরে তার সেই বীণার ঝংকার। রতন বললো, 'এখন হচ্ছে তো?'

'তাই তো! ভারি অবাক লাগছে। বিশ্বাস করব কেমন করে?'

রতন হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। গঙ্গা আবার বললো, 'অসময়ে এসেছেন, কিছু দিতে পারব না। বকুল চা আর মুড়ি নিয়ে আসছে।'

বললাম, 'ওতেই হবে।'

বলতে বলতেই বকুল ঢুকলো। একটি কাঁসার বাটি আর চায়ের গেলাস দুহাতে। একপাশে পাতা মাদুরের সামনে রাখলো। গঙ্গার দিকে ফিরে বললো, 'এবার তোমাকে দু ঘা দিই?'

'দে।' গা পেতে দেবার ভঙ্গি করলো, 'কিন্তু তুই বকুল যা। সুবুন্দির মা চালের হিসেব করতে পারবে না। আমি চাল মাপতে মাপতে চলে এসেছি। তারপরে যত খুশি মারিস।'

বকুল চলে যাবার আগে বললো, 'তা যাচ্ছি। কিন্তু গঙ্গাদি, তোমাকে মারব কিন্তু সত্যি। তুমি আমাকে শুধু মিথ্যুক বলনি। বলেছ, ওরকম লোকের নামে বাজে কথা বলিসনে।'

গঙ্গা হাত জোড় করলো। মুখে ক্ষমা চাওয়ার অভিব্যক্তি। বকুল হাসতে হাসতে চলে গেল। এখানে আমার আড়ষ্টতার কিছু নেই। একবার এসেছি। তবু যেন অনেকদিনের চেনা জায়গা। মাদুরে বসে কাঁসার বাটি টেনে নিলাম। মুড়ির সঙ্গে দু-চার মণ্ডাও আছে। খেতে শুরু করে দিলাম। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে হাসলাম, 'আপনার খবর সব ভালো?'

'খুব।' গঙ্গা হাসলো। চেনা হাসি। শালীন ভদ্র। মুখখানি একটু গোল, পুষ্ট ঠোঁট, ভাসা চোখ, টিকলো নাক। হাসলে বাঁ গালে ছোট একটু টোল খায়। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কেমন আছেন?'

বললাম, 'ভালো। যমুনা কোথায়?'

'যমুনার তো গত ফালগুনে বিয়ে হয়ে গেল!' গঙ্গা অবাক হেসে বললো, 'ওমা, সেই কথাটাই এখনো আপনাকে বলা হয় নি!'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কার সঙ্গে? সেই—?'

'হ্যাঁ, কলকাতার ডাক্তার। চোত্ মাসের পূর্ণিমার এসেছিল।' গঙ্গা বললো।

আমার মনে পড়ে গেল, গঙ্গার শেষ কথা। ও এই আশ্রম ছেড়ে বাইরে যাবার কথা ভাবতে পারে না। অথচ মানবীর দেহ মনের সব আকর্ষণই ওর আছে। গঙ্গারও বোধ হয় সেই কথা মনে পড়লো। সেদিনের ভোরের ছবিটা আমার চোখের সামনে ভাসছে। সাধনস্থানের শিকের বেড়ার পাশে ঘুরতে ঘুরতে ও কথা বলছিল। আমি দেখছিলাম, যেন ও বন্দিনী হয়ে আছে লোহার গারদে। জিজ্ঞেস করলো, 'কী ভাবছেন? আপনার কথা মিলল না, তাই তো?'

অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। গঙ্গা মাথা ঝাঁকালো, 'মনে নেই? যখন বললাম, আবার আসবেন। আপনি বললেন, তখন হয়তো আপনাকে আর দেখতে পাব না।'

নিজের উক্তি মনে থাকে না। কথাটা বলেছিলাম, অন্য একটা প্রত্যাশায়। আজও তাই বললাম, 'না পেলেই খুশি হতাম।'

'কেন বলুন তো?' গঙ্গা ঘাড় কাত করে, ভুরু কুঁচকে তাকালো, 'বাবা রোজ দুর দুর করেন, আপনিও দেখছি সেইরকম বলছেন?'

কথাটা বলা ঠিক হলো কি না বুঝতে পারছি না। চা মুড়ি খাওয়া শেষ। সিগারেট ধরিয়ে বিব্রত হাসলাম, 'আপনারও যদি যমুনার মতো—।'

কথাটা শেষ করতে পারলাম না। গঙ্গা আলগা বিনুনি দুটো খুলে ফেললো। ছড়িয়ে দিল ঘাড়ে পিঠে। মুখের সরস হাসিটা ম্লান হয়ে গেল, 'একটা কথা বাবাকে আর আপনাকে ছাড়া কারুকে বলিনি। ভুলে গেছেন বোধহয়?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না ভুলিনি। রাগ করলেন না তো?'

'না' গঙ্গা মাথা নাড়লো, 'আমি মিথ্যে বলিনি। বাবার দুশ্চিন্তা বাড়ছে। ভাবি, এত দুশ্চিন্তার কী আছে? বাবা যদি পথ থেকে কুড়িয়ে আনতে পারেন, বাকি জীবনটা থাকতে দিতে পারেন না?'

আমি গঙ্গার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। চোখে চোখ পড়তে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। ওর সেই বীণার বিষণ্ণ সুর কানে বাজলো, 'আমি আমার বাবা মাকে চিনিনে। সংসার কী, বুঝি নে। অথচ আপনাকে বলতে সংকোচ নেই—আমার মতো মেয়ের যে কামনা বাসনা থাকা উচিত, আমার তাও আছে। কিন্তু সেখানে আমি যেতে পারব না।'

বললাম, 'উনি তো বাবার মতো ভাবেন। উপযুক্ত বয়সে মেয়ের গতি করতে চান সব বাবা।'

'কিন্তু বাবা তো মেয়েকে জানেন।' গঙ্গা ম্লান হেসে বললো, 'আরো যত দিন যাচ্ছে, ততো বুঝতে পারছি আমি মিথ্যে বলিনি। বরং, আজকাল আরো বেশি করে মনে হচ্ছে, আশ্রম ছাড়া আমার জীবন নেই। আমি কোথাও গিয়ে, কোনো মঙ্গল করতে পারব না।'

মনোহরার কথা মনে পড়ে গেল। একই গঙ্গার কূলে। কতো আর দূরে। দু'জনের মধ্যে কোথায় একটা অস্পষ্ট মিল রয়েছে যেন। সেই কথাটাই মনে পড়ে। অতি বড় সুন্দরী না পায় বর, অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর। শ্রীপুরের আখড়া আর এই আশ্রম হয়তো ঘর। কিন্তু এ ঘরে সে-ঘর নেই। গঙ্গা অজ্ঞাতকুলশীলা। মনোহরা যৌবনে পা দিয়েই পিশাচের খড়্গে ছিন্নভিন্ন। তার জীবনে কোথাও একটা অস্পষ্ট যুক্তি আছে। গঙ্গার মনের স্রোতে ভয়ংকর ঘূর্ণিপাকটা কীসের?

'চলুন, বাবার কাছে বসবেন। পরে কথা হবে।' গঙ্গা উঠে দাঁড়ালো।

আমি সিগারেট নিভিয়ে দিয়ে নাটমন্দিরে গেলাম। তাকে ঘিরে যারা বসেছিল, তারা নেই। ক্ষ্যাপাবাবা কাছে হাতের ইশারায় দেখালেন, 'এস বাবা, এবার শুনি তোমার কথা। তা চৈত্রে কি গাজনের সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়েছ?'

কাছে বসে বললাম, 'তা একরকম বলতে পারেন।'

গঙ্গা বসলো একটু দূরে, একটা থামের কাছে। ক্ষ্যাপাবাবা ভুরু নাচিয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে গঙ্গে, ও তো আবার ধর্মে নেই। কী বলে বল দিকিনি?'

'কথা কিছু হয়নি বাবা।' গঙ্গা বললো, 'খালি বললেন, আমাকে এসে না দেখলে খুশি হতেন।'

ক্ষ্যাপাবাবার টানা গভীর চোখ বড় হয়ে ভেসে উঠলো, 'বলেছে? তবে আছিস কেন?'

তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমার বলাটা ভুল হয়েছে।'

'কিছু ভুল হয়নি।' ক্ষ্যাপাবাবা গোঁফ-দাড়িতে হাতের ঝাপটা দিলেন, 'এবার ওকে গঙ্গায় চুবিয়ে মারব, নয়তো কালে খাওয়াব। কাছে এসে বোস।'

গঙ্গা ক্ষ্যাপাবাবার পায়ের কাছে গিয়ে বসলো। ওর গলায় হাত বেড়িয়ে ধরলেন। আমাকে বললেন, 'আসলে কালে ওকে খেয়েছে, আর নতুন করে কী খাওয়াব? তা বাবা, এবার বল দেখি, শ্রীপুরে কোথায় গেছলে?'

'গোলকদাসের আখড়ায়?' ক্ষ্যাপাবাবা, আর গঙ্গা দুজনেই বিস্ময়ে ঝলকে উঠলেন। দৃষ্টিবিনিময় হলো দু'জনে। ক্ষ্যাপাবাবা অবাক জিজ্ঞাসু চোখে ঘাড় ঝাঁকালেন।

গঙ্গা হাত উল্‌টে বললো, 'বুঝতে পারছিনে বাবা।'

'বুঝিয়ে বলতো বাবা।' ক্ষ্যাপাবাবা আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন, 'সেখানে কেন?'

'শ্রীপুর দেখতে গেছলাম। একজন আখড়াতে যেতে বলেছিলেন। তাই গেছলাম।'

'মনোহরাকে দেখেছ?' ক্ষ্যাপাবাবার চোখে গভীর অনুসন্ধিৎসা।

গঙ্গার চোখেও। এঁরাও তা হলে মনোহরাকে চেনেন? বললাম, 'দেখেছি। উনিই দু'দিন আটকে দিলেন।'

'অ্যাঁ।' ক্ষ্যাপাবাবার চোখ গোল। তারপরেই তাঁর সেই হাসির দানায় টপ্পা বেজে উঠলো, 'শোন্ গঙ্গা শোন্। তা মনোহরা জানে, তুমি এখানে আসছ?'

বললাম, 'না তা বলিনি তো? কেন?'

'বললে খুশি হতেন।' গঙ্গা বললো, 'বাবাকে মাঝে মাঝে দেখতে আসেন। গোলকদাস গোঁসাই পছন্দ করেন না, তাতে ওঁর কিছু যায় আসে না।'

এ আবার নতুন সংবাদ। সহজিয়া বৈষ্ণবী আসে শক্তি সাধকের কাছে। সব দেখছি তালে গোল। নাকি গোলেই তাল বাজে। ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'বলবে তো বাবা। সে যে আমার আর এক মেয়ে। কিন্তু তার গুণ তুক তো ভয়ংকর। ছেড়ে দিল?'

'তিন রাত্রি রেখেছিলেন।'

ক্ষ্যাপাবাবার আবার টপ্পা হাসির দানা বাজলো, 'শোন্ গঙ্গা শোন্। তা কেমন বুঝলে আমার বোষ্টমী মেয়েটিকে?'

হঠাৎ জবাব দিতে পারলাম না। গঙ্গার দিকে তাকালাম। গঙ্গা আমার দিকেই তাকিয়েছিল। চোখে তার গভীর অনুসন্ধিৎসা। ক্ষ্যাপাবাবা ভ্রূকুটি চোখে ঘাড় ঝাঁকালেন, 'কী? কথা বলছ না যে?'

বললাম, 'দেখুন, আমার কাছে যা কষ্ট, আর একজনের কাছে হয়তো তা নয়। ওঁকে দেখে মনে হলো, উনি সুখ-দুঃখের অতীত হয়েছেন।'

ক্ষ্যাপাবাবার চোখে পরম বিস্ময়। তাকালেন গঙ্গার দিকে। তারপরে আমাকে টেনে নিলেন বুকের কাছে, 'তাই তোমার মন কেঁদেছে। কিন্তু বাবা আমার, দেখলে কেমন করে? আমার ও মেয়েটাকে তো সবাই এমনি করে চিনতে পারে না।'

'তাঁকে দেখে মনে হলো। এর বেশি কিছু জানি না।'

ক্ষ্যাপাবাবা মাথা ঝাঁকালেন। তাঁর বুক ভেদ করে নিঃশ্বাস পড়লো, 'ঠিক, সব কথা দিয়ে বোঝানো যায় না। কিন্তু এ কি তাজ্জব কথা, তুমি মনোহরার কাছে ছিলে? গোলকদাস গোঁসাই কী বললে?'

'আমাকে দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।'

ক্ষ্যাপাবাবার টপ্পা দানা হাসির সঙ্গে, গঙ্গার বীণা ঝংকার সুর মেলালো। ক্ষ্যাপাবাবার গোঁফ-দাড়ি আমার গলায় মুখে সুড়সুড়ি দিতে লাগলো। বড় অস্বস্তি। কিন্তু দুষ্টু বালকের হাসি যেন আর থামতে চায় না। তারপরে হঠাৎ থেমে, আমার কপালে হাত রেখে বললেন, 'ধর্ম তো তুমি মানো না। কিন্তু জেনে রাখ বাবা, পুণ্যি করে এসেছ। তুমি আমাকে নৌকোয় কী বলেছিলে মনে আছে?'

আমার ঠেক লাগলো। গঙ্গা বললো, 'আমার মনে আছে।'

'বল তো।'

'উনি বলেছিলেন, যিনি শক্তি, তিনিই প্রেম। প্রেমই শক্তির আধার।'

কথাটা আমার না। আমি যেমন শুনেছিলাম, তেমনি বলেছিলাম। আজ মনোহরার পায়ে হাত দিয়ে প্রায় একই কথা বলে এসেছি। ক্ষ্যাপাবাবার দু' চোখে জল টলটলিয়ে উঠলো। বললেন, 'অই, অই, অই হলো মনোহরা। বুঝতে পেরেছিলে?'

মাথা নেড়ে হাসলেন। তিনি আমার চুলের মুষ্ঠি চেপে ধরলেন। চোখে চোখ রাখলেন। মনোহরার মুখ আমার সামনে ভেসে উঠলো। আমি তো কোনো অধ্যাত্ম ধ্যানে নেই। অলৌকিক চেতনা নেই। আমার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখছি, সেখানে মনোহরা ঘন অন্ধকার মেঘে ভার। বজ্র তার চোখে। বললাম, 'তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

'শোন্ গঙ্গা, শোন্। ও তো ধর্মে নেই, মনোহরাকে শ্রদ্ধা করে।' ক্ষ্যাপাবাবা আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিলেন, 'বড় খুশি হলাম। তোমার সঙ্গে মনোহরার দেখা হয়েছে। তা এবার বল তো বাবা আমার, চৈত্রের গাজন খেলাটি কোথায়? আমার এখানেই তো?'

বললাম, 'না। সামনে বৈশাখী পূর্ণিমা। জামালপুরে যাবো।'

'জামালপুর?' ক্ষ্যাপাবাবা ভ্রূকুটি বিশাল চোখে তাকালেন গঙ্গার দিকে।

গঙ্গা মাথা নাড়লো, 'আমি তো জামালপুরের বিষয় কিছু জানিনে।'

'সে আমি জানি।' ক্ষ্যাপাবাবা আমার দিকে তাকালেন, 'সেখানকার কথা তোমাকে কে বললে?'

বললাম, 'অনেকদিন আগে একজনের মুখে শুনেছিলাম। বৈশাখী পূর্ণিমায় সেখানে ধর্মরাজের উৎসব হয়। বইয়েতেও কিছু পড়েছি। দেখবার খুব ইচ্ছে।'

'হুঁ, বাবায় টেনেছে।' ক্ষ্যাপাবাবার ভুরু নেচে উঠলো, 'ধর্মরাজ তো নেই আর।

উনি এখন বুড়ো শিব হয়েছেন। খবর ঠিকই নিয়েছ। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন সেখানে রক্ত নিয়ে হোলি খেলা হয়।'

গঙ্গার চোখে উৎকণ্ঠিত বিস্ময়। বললাম, 'শুনেছি অনেক বলি হয়।'

'হ্যাঁ, হাজার গণ্ডা। আর বলি নিয়ে মারামারি কাড়াকাড়ি। বাবার চেলারা উপোস থাকে। তবে নির্জলা নয়।'

ক্ষ্যাপাবাবা হেসে বাজলেন, 'লাঠি বর্শা হাতে মেয়ে মদ্দ সব একেবারে কাঁচা খেগো দেব দেবী। তা বাবা, ধর্মরাজ তোমাকে টানলেন কেন? দ্রব্য চাপিয়ে মত্ত হবে?'

মাথা নেড়ে হাসলাম, 'আজ্ঞে না। কেমন ইচ্ছে হলো, একবার দেখে আসি। শুনেছি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই একবার সেই গ্রামে গেছলেন। মনে হয় ধর্মরাজকে পরে বুড়ো শিব করেছেন ব্রাহ্মণেরা। আসলে ইনি বৌদ্ধদের কোনো দেবতা। ধর্ম অবিশ্যি বৌদ্ধ দেবতাই। আমি আমাদের দেশের জাত যোদ্ধাদের পুজো দেখতে চাই।'

'ওলো গঙ্গে, তবে এর ঘাড়ে বেশ্যার মড়া চাপবে না কেন?' ক্ষ্যাপাবাবা গঙ্গার দিকে বড় চোখ করে তাকালেন, 'কলকাতা থেকে যাচ্ছে ও বলির লড়াই দেখতে। আবার খবরও নিয়ে এসেছে, আদতে উনি বুড়োশিব নন, বৌদ্ধদের ধর্মঠাকুর।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'ভুল খবর নাকি?'

'ভুল হবে কেন?' বুদ্ধের ধর্ম, আর হিন্দুর শিব একাকার হয়ে গেছেন। ধর্মরাজের রাজা, আর বুড়ো শিবের বুড়ো, দুইয়ে মিলে বুড়োরাজ। দেবতাটির আসল পরিচয় জান?' ক্ষ্যাপাবাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'অই তোমার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাঁর নাম করলে, তিনি কিচ্ছু লিখেছেন নাকি?'

বললাম, 'লিখে থাকলেও পড়িনি। জামালপুরে গেছলেন, শুনেছি।'

'তা তোমাকে বুড়োরাজ টানলেন কেন, সত্যি করে বলতো বাবা আমার?' ক্ষ্যাপাবাবা আমার কোলের ওপর হাত চেপে, নড়ে বসলেন। গঙ্গাকে ইশারায় দেখালেন আমাকে, 'ওর তল পাওয়া দেখছি মুশকিল।'

গঙ্গার দু'চোখ ভরা কৌতূহল। আমি বললাম, 'ঐ যে আপনি বললেন, ধর্মরাজের রাজা, বুড়োশিবের বুড়ো, দুইয়ে মিলে বুড়োরাজ, সেইটাই আমাকে টেনেছে। ধর্মরাজ তো আগে জাত হিন্দুর দেবতা ছিলেন না। জাত হিন্দুরা যাদের ছোটলোক বলেছে, যাদের জলচল নেই, সেই অচ্ছুতদের গ্রাম দেবতা ধর্মরাজ। আদিতে তিনি ছিলেন বৌদ্ধ। জামালপুরে যিনি এখন আদি লিঙ্গ বলে পুজো পাচ্ছেন, তিনি মোটেই লিঙ্গ কি না, সন্দেহ তো সেখানেও।'

'সন্দেহ করবার তোমার দরকার কী?' ক্ষ্যাপাবাবা আমার কোলে চাপড় মারলেন, 'তুমি যা ভেবেছ, সেটাই তো ঠিক। ধর্মরাজকে বামুনেরা পরে শিব গড়েছে। জামালপুর হল পূর্বস্থলী থানার মধ্যে। এখনো বিস্তর ধর্মরাজের পুজো হয়

অনেক গাঁয়ে, পুরোতরা সব নিচুতলার। বাড়ুজ্জে চাটুজ্জে মুখুজ্জেদের কোনো ঠাঁই নেই সেখানে।'

ক্ষ্যাপাবাবা খবর রাখেন আমার থেকে বেশি। বলাতে চাইছেন আমাকে দিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কখনো জামালপুরে গেছেন?'

'যাব না কেন?' ক্ষ্যাপাবাবার হাসিতে আবার টপ্পা দানার কাজ, 'সে কি আজকের কথা নাকি?'

গঙ্গা বলে উঠলো, 'এ খবর জানিনে তো?'

'তুই তখন কোথায় রাক্ষুসী।' ক্ষ্যাপাবাবা বলেই, চোখ ঘুরিয়ে মা কালী। জিভ কেটে আমার দিকে তাকিয়ে ইশারায় গঙ্গাকে দেখালেন।

আমি হেসে তাকালাম গঙ্গার দিকে। গঙ্গা ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, 'আমি তো রাক্ষুসীই। সব খেয়ে উজাড় করে দিচ্ছি।' উঠে যাবার চেষ্টা করলো।

ক্ষ্যাপাবাবা গঙ্গার হাত টেনে ধরলেন, 'তোকে বলিনি। ওই মন্দিরের মধ্যে যে মেয়েটা আছে, তাকে বলেছি। এখন এর কথা শোন। আমি যখন জামালপুরে গেছি, তখন সত্যিকারের লড়াই হত। কথাটা সত্যি, বলি নিয়ে কাড়াকাড়ি হত বটে, আসলে কাড়াকাড়ি নয়। সবাই বাঁশের লাঠি নিয়ে রায়বেশে আসত। বলি সামনে রেখে, লড়াই হত। সে সব লাঠি খেলার কী মারপ্যাঁচ। যেমন হুংকার, তেমনি লাঠির সঙ্গে মদ্দ আর মত্ত বাগদি মাটি থেকে দশ হাত উঁচুতে লাফিয়ে উঠত। যার জিত, তার বলি। কিন্তু এখন আর সে সব নেই। এখন সত্যি মারামারি হয়। খুনোখুনিও হয়ে গেছে দু'চারটে। তারপর থেকে জামালপুরের মেলায় পুলিশ পাঠানো হয়। তা তোমার টানটা তো ঠিক বুঝলাম না বাবা?'

বললাম, 'যা বললেন, ওটাই আমার টান। এদিকে বীরের লড়াই। অথচ দিনটি হলো অহিংসার পরম করুণাময় বুদ্ধের জন্মদিন, বৈশাখী পূর্ণিমা। নিজের দেশ কাল আবার ধর্ম, কিছুই জানিনে। তাই একটু দেখতে যাওয়া। বই পড়ে কেমন একটা কৌতূহল হয়েছে, বুড়োরাজ নামটাই অদ্ভুত। আর কোথাও শুনিনি।'

'শুনবে কেমন করে? ভাগাভাগি করা হয়েছে, বললাম না?'

'তা হলে জাতপাতে মেশামেশি হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, একরকম তাই বলতে পার। ঠাকুরের দু' পাশে দুভাগে নৈবেদ্য দেওয়া হয় এক পাশে ধর্মরাজের, আর এক পাশে শিবের। মাঝখানে কাটা দাগ আছে।'

কী আশ্চর্য আপোষ আর উদারতা।

তবু কেন এত জাত ফিরিস্তি? বললাম, 'সেই উৎসব একবার দেখতে যাব।'

'থাকবে কোথায়? সেবাইত বামুনদের সঙ্গে চেনা আছে?' ক্ষ্যাপাবাবা ভ্রূকুটি গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন।

হেসে বললাম, 'জীবনে কোনোদিন যেখানে যাইনি, সেখানে কারোকে চিনবে কেমন করে?'

'তার মানে, তোমার সেই আহার যত্রতত্র, শয়ন হট্টমন্দিরে।' ক্ষ্যাপাবাবা হাত তুলে নাড়লেন, 'বৈশাখী পূর্ণিমার দিন ওখানে হট্টমন্দির বলেও কিছু থাকে না। গাঁয়ের বেশির ভাগ লোকই হল চাষাভুষো। বলি আর রক্ত ছাড়া ওই দিন কারোর কোনোদিকে নজর থাকে না। কেবল রক্ত আর রক্ত। এমনকি মুসলমানরাও মানত করে।'

'মুসলমান মানত করে? বুড়োরাজের দ্বারে?'

'হ্যাঁ, বুড়োরাজ এমনি দেবতা, তাঁর কাছে সব ধর্ম একাকার। বুঝেছি, টানটা তোমার সেই জন্যেই।' ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'এখন বল তো, যাবার কী ব্যবস্থা ভেবেছ?'

বললাম, 'পাটুলি ইস্টিশন থেকে জামালপুর হেঁটে যাবো।'

'কত মাইল পথ জান।' ক্ষ্যাপাবাবার স্বর গম্ভীর।

বললাম, 'শুনেছি দু'চার মাইল হবে।'

'তোমার মুণ্ডু আর মাথা।' ক্ষ্যাপাবাবা আবার আমার হাঁটুতে চাপড় মারলেন। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মাথাটা খারাপ। কম করে ছ' সাত মাইল রাস্তা। রাত্রে থাকবার জায়গা নেই। বলি নিয়ে কাড়াকাড়ি রক্তের ছড়াছড়ি। হাজার হাজার বলি, একটা আধটা নয়। এতো হল বুড়োরাজের গাজন। এ গাজনে, চেলারা গলা শুকনো রাখে না। অন্যদিকে সন্ন্যেসীদের ভর হয়। ভরে তোমার বিশ্বাস আছে?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

'আমি তো ভেবে কিছু মাথামুণ্ডু পাচ্ছিনে।' ক্ষ্যাপাবাবা চোখ বুজলেন।

তাঁর ভেবে মাথামুণ্ডু পাবার কী আছে? আমি গঙ্গার দিকে তাকালাম। তাকিয়ে অবাক। সেখানে আবার আর এক ইশারা। গঙ্গা নিজের বুকে হাত দিয়ে ইশারা করছে। ঘাড় ঝাঁকাচ্ছে। মানে কী? আবার আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে, উঁচুতে তুলে দেখালো। ক্ষ্যাপাবাবা চোখ খুলেই, খপ্ করে গঙ্গার হাত চেপে ধরলেন। দৃষ্টি রোষ কষায়িত। গঙ্গার মুখ লাল। চোখ নত। ক্ষ্যাপাবাবা তাকালো আমার দিকে। রক্ষা করুন, আমি কিছু বুঝতে পারিনি।

'তোর সাহস তো কম নয়?' ক্ষ্যাপাবাবা গঙ্গার খোলা চুলের গোছা মুঠি পাকিয়ে ধরলেন, 'তুই যেতে চাস ওর সঙ্গে?'

সর্বনাশ। গঙ্গার ইশারায় সেই কথা? গঙ্গার এক হাত এসে পড়লো ক্ষ্যাপাবাবার পায়ের ওপর। ক্ষ্যাপাবাবা তাকালেন আমার দিকে, 'তুমি আমার মেয়ের মন কাড়ছ?'

ব্যস্ত উৎকণ্ঠায় বললাম, 'না বিশ্বাস করুন—।'

'থাক, আর কথা বাড়াতে হবে না।' ক্ষ্যাপাবাবা হাত তুললেন, 'এটাকে দিয়ে আর কিছু হবে না। একে তুমিই নাও।'

মনে হলো, আমার কাছা খুলে গিয়েছে। এবার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দেবো। কিছু

বলতে গেলাম। গোঁফ-দাড়ির ভেতর থেকে অট্টহাসি বেজে উঠলো, 'কেন, ক্ষতি কী? ঘরের বউ সতীন দেখে মেরে তাড়াবে?' কী সর্বনেশে লোক! আবার বললেন, 'ও তো তোমার ঘরে যাবে না। তোমার সঙ্গে পথে পথে ফিরবে। কী, তাই তো চাস?' গঙ্গার দিকে তাকালেন।

গঙ্গা ঘাড়ে ঝটকা দিল, 'মোটেই তা বলিনি। ওঁর সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করছে। এখন আপনি অনুমতি দিলে হয়।'

উদ্বেগে কঁকিয়ে উঠলাম, 'আমার সঙ্গে যাবেন?'

'হ্যাঁ, খুব ইচ্ছে করছে।' গঙ্গার চোখে সকাতর প্রার্থনা, 'আপনার মতো যদি ঘুরতে পারতাম, তবে আর আমার কিছু চাইনে।'

ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'আমি তো সেই কথাই বলছি। গেরুয়া পর, রুদ্রাক্ষের মালা জড়া। হাতে একটা ত্রিশূল নে। ভৈরব ভৈরবী বেরিয়ে পড়।'

একে বলে চোখে ধুত্‌রো ফুল দেখা। গঙ্গা বললো, 'কেন বাবা মিছিমিছি ওঁকে ভয় দেখাচ্ছেন। দেখুন মুখের কী অবস্থা হয়েছে।'

'ও সব ছলাকলা।' ক্ষ্যাপাবাবার টানা চোখে রহস্যের ঝিলিক, 'বেশ্যার মড়া কাঁধে বইতে পারে, আর তোকে নিয়ে ঘুরতে পারবে না?'

বললাম, 'আজ্ঞে না।'

ক্ষ্যাপাবাবা হা হা হেসে নাটমন্দির কাঁপালেন। সেই সঙ্গে গঙ্গার বীণার ঝংকার। ক্ষ্যাপাবাবা আবার চোখ বুজলেন। গঙ্গার হাসিটি এখন উজ্জ্বল। চোখে ইশারা নেই। আমার বুকে সংকটের বোঝা, উদ্বেগে কথা বন্ধ। হাসা দূরের কথা। ক্ষ্যাপাবাবা চোখ খুললেন, 'হুঁ, তা হলে আজ হল একাদশী। কাল চোত সংক্রান্তি। পরশু ত্রয়োদশী। ওর তো কোনো ধারণা নেই। বলে পাটুলিতে নেমে, হেঁটে যাবে জামালপুরে, বুড়োরাজের মেলায়। তারপর নিজেই বলি হয়ে যাক।'

বললাম, 'আমি ঠিক পারবো।'

'পারতে যদি আমার এখানে না আসতে।' ক্ষ্যাপাবাবা হাতের ঝাপটায় আমার কথা উড়িয়ে দিলেন, 'আর আমার মেয়ে যখন যেতে চেয়েছে, সে তোমার সঙ্গেই যাবে। তবে পাটুলি থেকে নয়, বেলেরহাট দিয়ে যেতে হবে।'

'বেলেরহাট? সেটা আবার কোথায়?'

'পাটুলির আগের ইস্টিশন।' ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'বেলেরহাট ইস্টিশান থেকে এক ক্রোশ হাঁটতে হবে। চিঠি লিখে দেব, তোমরা যাবে বনমালী মুখুজ্জের বাড়ি। সে তোমাদের জামালপুর যাবার ব্যবস্থা করবে।'

গঙ্গার চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠলো। আমি বললাম, 'কিন্তু আমি তো সেখান থেকে চলে যাবো কাটোয়ার দিকে?'

'রক্তারক্তি থেকে একেবারে বৈষ্ণবের দরজায়?' ক্ষ্যাপাবাবা ভ্রূকুটি চোখে তাকালেন।

বললাম, 'অজয় পেরিয়ে চলে যাবো বীরভূমে।'

'গঙ্গা যদি সঙ্গে যায়—।'

'শুনুন।' আমি প্রায় আঁতকে উঠলাম।

গঙ্গা খিলখিল করে হেসে উঠলো, 'কেন বাবা ওঁকে ওরকম ভয় দেখাচ্ছেন? শেষটায় সব ভেস্তে যাবে। পূর্ণিমার পরের দিন, আমি বেলেরহাট থেকে এখানে ফিরে আসব। উনি যাবেন ওঁর পথে।'

'তুমি আমার মেয়েকে একলা ছেড়ে দিতে চাও?' ক্ষ্যাপাবাবা তাকালেন আমার চোখের দিকে।

কী ক্ষ্যাপার পাল্লায় পড়লাম। গঙ্গার দিকে তাকালাম। গঙ্গা চোখের ইশারায় ঘাড় ঝাঁকালো। অর্থাৎ, ইশারা দিচ্ছে, হ্যাঁ তাই বলুন। আমি বললাম, 'তা কেমন করে ছেড়ে দিতে পারি?'

'এই হল ওর ধর্মের কথা। ও তো ধর্মে নেই।' ক্ষ্যাপাবাবা আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন, 'শোন, যার যেদিকে মন, সে সেদিকে যাবে। মেয়ে আমার তোমার সঙ্গে যেতে চেয়েছে। আমি অনুমতি দিচ্ছি। তোমাকে আমি একটু আধটু চিনেছি বাবা। মেয়ে আমার অবলা নয়। তবে, তোমার রঙটা লেগেছে। যেখানে খুশি তোমরা ছাড়াছাড়ি করো, আমার বলার কিছু নেই। সব মেয়ের গতি হবে। এটার যে কী হবে, জানিনে। শেষে মন্দিরেই না পুঁতে রাখতে হয়।' তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

গঙ্গা ক্ষ্যাপাবাবার পায়ের কাছে নুয়ে পড়লো। আমি যেন সংকটমুক্ত অস্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

ব্যবস্থাটা ভালোই হয়েছিল। বেলেরহাটের বনমালী মুখোপাধ্যায় সম্পন্ন গৃহস্থ। শ্যামাক্ষ্যাপার পরম ভক্ত। গঙ্গাকে নিয়ে চতুর্দশীর দিন তাঁর গৃহে পৌঁছেছিলাম। অভ্যর্থনা রাজকীয়। জামালপুরের যাত্রী কেবল আমরা ছিলাম না। মুখুজ্জেমশাই স্বয়ং এবং আরও কয়েকজন। তাঁদের সঙ্গে বলির পশু সাতটি। তিন গরুর গাড়ি নিয়ে যাত্রা। এক গাড়িতে আমি আর গঙ্গা। বাকি মুখুজ্জে মশাই, আর তাঁর ব্যাঘ্র-ক্ষত্রিয়, বাউরি লেঠেল সঙ্গীরা। আমাদের গাড়ির ছইয়ের সঙ্গে দুটো জলের জালার গলা দড়ি দিয়ে বেঁধে নেওয়া হয়েছিল। কারণ জলাভাব নাকি নিদারুণ। জলের বদলে রক্ত খেয়ে তৃষ্ণা মেটাতে হয়। কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করেনি। তবে অবস্থা প্রায় সেইরকম।

পাটুলি থেকে হাঁটা পথ ছ'মাইল। বেলেরহাট থেকেও কিছু কম না। বেলেরহাট থেকে রাস্তা এসে মিশেছে নিমদহে। চলতি কথায় নিমদে। গরুর গাড়ি সারি সারি তো বটেই। রাস্তার ধুলা উড়িয়ে শত শত মেয়ে পুরুষ চলেছে জামালপুরে। বুড়োরাজের মেলায়। প্রত্যেকের কাঁধে বুকে বলির পশু। পুরুষদের প্রকৃতই রণসাজ।

নিমদে গ্রামের পথে ডান দিকে ঘুরলেই সুদীর্ঘ এক জলাশয়।

আমাদের গাড়ির চালক বললো, 'এইটে আসলে গঙ্গা। গঙ্গা এখানে ছিল, এখন সরে গেছে।'

কথাটার সত্যি মিথ্যে জানি না। তবে ঝিল বিলের থেকে অনেক বড়। গোটা নিমদে গ্রাম ঘুরে, জামালপুরের প্রান্তে গিয়ে শেষ। দু' ধারে গ্রাম। তবে গ্রাম চেয়ে দেখার উপায় নেই। গায়ে মাথার চুলে তো বটেই, চোখের পাতায়ও ধুলা। ধুলা মুখের মধ্যে। দাঁতে কিচকিচ।

গরুর গাড়ির চালক আমাদের গাইড। নিমদেয় পড়ে পুরনো গল্পটা সে বললো। গঙ্গা উপুড় হয়ে শুয়েছিল খড়ের ওপর শতরঞ্জির বিছানায়। আমি এক পাশে কাত হয়ে বসে। গল্প শুরু হতেই গঙ্গা উঠে বসলো। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, ধূলামাখা যোগিনী। চোখে মুখে খুশির ছটা। ভাবটা, যাবো না যাবো না যাবো না ঘরে।

চালক বললো, 'এই যে দেখছেন নিমদে গাঁ, যদু ঘোষ নামে এক পুণ্যমন্ত লোক ছিল। বিস্তর তার গরু মোষ। তার মধ্যে এক মায়ের (গাভী) নাম শ্যামলী। যদু ঘোষের নজরে পড়ল, শ্যামলীর বাঁটে দুধ থাকে না। দুইবার সময় সব গাই দুধ দেয়। শ্যামলীর বাঁট শুকনো। এমন কেন? নজর রাখতে লাগল। দেখলে, সব গরু মোষ এক জায়গায় চরতে যায়। শ্যামলী চলে যায় জামালপুরে। যদু ঘোষ পিছু নিলে একদিন। জামালপুর তখন জঙ্গলে ভরা। সেঁয়াকুল, বেত আর বাবলা বন। যদু ঘোষ দেখলে শ্যামলী এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। আর তার বাঁট থেকে ফোয়ারার মতন দুধ ঝরছে। দেখেই ঘোষের মাথা ঘুরে গেল। বিত্তান্ত কী। ছুটলে বামুনের কাছে। তাঁর নাম মধুসূদন চাটুয্যে। তিনি সব শুনে ঘোষের সঙ্গে সেই জায়গায় গেলেন। গিয়ে দেখেন, দুধ ঝরে পড়ছে এক পাথরের মাথায়।'...

গরুর গাড়ির চালকের অলৌকিক গল্প অলৌকিকতর। বেলা সামান্য বাড়তে না বাড়তেই বৈশাখের খর রৌদ্র গরুর গাড়ির ছই তাতিয়ে তুললো। আমি বললাম, 'এই পাথরটাই ইতিহাসের একটা সংকেত।'

'সেটা কী?' গঙ্গা পা ছড়িয়ে বসেছিল। পা গুটিয়ে গল্প শুনতে বসলো। স্থির হয়ে বসা যায় না। টাল সামলাতে গিয়ে ঘাড়ের ওপর পড়েছে কয়েকবার। লজ্জা পাওয়া অকারণ। বললাম, 'ওটা আমার ধারণা। পাথরটাকে শিবলিঙ্গ বলা হচ্ছে। আসলে সেটা শিবলিঙ্গ নয়। রাঢ়ের এসব অঞ্চলে এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের জোয়ার ছিল। নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে বৌদ্ধ দেবদেবীর নানা মূর্তি। এ পাথর তারই কোনো টুকরো হতে পারে। হতে পারে, কোনো বিগ্রহের শিলা বেদী।'

'শ্যামলীর ঘটনাটা কী?' গঙ্গা ছোট বালিকার মতো জিজ্ঞেস করলো।

বললাম, 'ভক্তি আর ভালবাসার গল্প। আবিষ্কারটা যদু ঘোষের থেকে চাটুজ্যে মশাইয়ের বেশি। কারণ স্বপ্নটা তো তিনিই দেখেছিলেন। দেবতা তাঁকে বলছেন, আমার নিত্য পূজা কর। কোনো জাঁকজমক হবে না। শুধু দুধের ভোগ। মন্দির হবে গরীবের কুঁড়েঘর। তার মানে কী?'

'কী?' গঙ্গার ভাসা চোখে ব্যগ্র জিজ্ঞাসা।

বললাম, 'গরীব মানুষের দেবতা। পাথর রাখা হয়েছিল কোনো গরীবের ঘরে। জাঁকজমক কেমন করে তারা করবে? আসলে তো তিনি ধর্মরাজ। হিন্দুর দেবতার বদলে রাঢ়দেশে লোকদেবতা বা গ্রাম্য দেবতার মধ্যে ধর্মরাজ সব থেকে প্রাচীন। বলা হয় বটে, তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের দেবতা। আসলে তিনি ছিলেন সমাজের নিচু শ্রেণীর মানুষের উপাস্য। যে মানুষেরা ছিল রাজার সৈন্যবাহিনীর বীর যোদ্ধা। সামন্ত রাজাদের অধীনে তারাই ছিল সৈন্য যাদের ঢাকে বাজতো দগর, রক্তে। পায়ে ঝমঝম বাজনা ঝাঁজর। লাঠির ঘায়ে তরোয়াল উড়ে যেতো। তাদের দেবতা তো ইঁট পাথরের মন্দিরে থাকতে পারে না। অতএব, চাটুজ্যে মশাই দেবতার বরাত দিলেন কুঁড়েঘর। কারণ সেখান থেকে তাঁকে নাড়াবার উপায় ছিল না। ধর্মরাজ বীরত্ব আর শক্তির প্রতীক।'

'ব্রাহ্মণরা কেন ধর্মরাজকে শিব করলেন।' গঙ্গা ঘাড় কাত করে তাকালো। খোলা চুলে কপাল গাল ঢাকা। শরীর দুলছে টলছে গরুর গাড়ির চাকার তালে।

দুলছি আমিও। মাথা ঠুকে যাচ্ছে জলের জালায়। বললাম, 'ইতিহাসের সময়টা বদলে গেছে তখন। বৌদ্ধ দেবতাকে হিন্দু না করতে পারলে মন মানছিল না। মনটা তো আসলে সকলের ভক্তিতে এক জায়গায়। রোগ শোক দুঃখ, সব কিছুর জন্যই ঈশ্বর নানারূপে দেবতা। ধর্মরাজকে হিন্দু করতে অসুবিধা কী? এখানেই তো আপোষ। আর এখানেই পরস্পরের মিলন, আর মাখামাখি। বিবাদের মিটমাট। ধর্মরাজের রাজ বুড়োশিবের বুড়ো, বুড়োরাজ। কিন্তু রাস্তায় কাতার দিয়ে যাদের যেতে দেখছি, তাদের বেশির ভাগ কারা?'

'দেখে মনে হচ্ছে ছোট জাত।' গঙ্গা কথাটা বলেই চোখ নত করলো। লজ্জা পেয়ে হেসে বললো, 'সেই বীরের জাত।'

বললাম, 'হ্যাঁ, কারণ উৎসবটা প্রধানত তাদেরই। যে কারণে ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, মুসলমানরাও এখানে পাঁঠা মানত করে।'

'গাড়ি তো আর যাবে না বাবু।' চালক বললো।

গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লো। দেখলাম, লোকে লোকারণ্য। গাড়ি যাওয়া দূরের কথা, নিজেরা কেমন করে যাবো, সেটাই ভাবনা। বনমালীবাবু এসে আমাদের নামতে বললেন, 'একটু হাঁটতে হবে। কিন্তু জলের জালা নিয়ে যাওয়া চলবে না। ইনিয়ে খেয়ে নেবে। তেষ্টা পেলে এখানে এসে খেয়ে যেতে হবে।'

একটা আধটা নয়, অনেক গরুর গাড়ি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাচীন গঙ্গা পরিয়ে এসেছি। জামালপুরে ঢুকেছি। বাবার এলাকায় পা দিয়েছি। আসন্ন বলির পশুর আর মানুষের চীৎকার। ধুলায় ধুলাকার চারদিক। তার মধ্যেও সেই কুহু কুহু!...

গঙ্গা আমার একটা হাত চেপে ধরলো। আমি তাকালাম তার মুখের দিকে। সে লামাখা মুখ লাল করে বললো 'কোথায় হারিয়ে যাব জানিনে।'

হাতটা অনায়াসে ধরেনি। চারদিকে নরনারীর যে-রকম চাপাচাপি ঠাসাঠাসি হারিয়ে যাবার আশঙ্কাটা অমূলক না। দায়ে পড়েই ধরেছে। যারা আমাদের গায়ে গায়ে ঠেলে চলেছে, মেয়ে মদ্দ সবাই হাতে হাত তো বটেই। মেয়ে বউরা পুরুষের ধুতির সঙ্গে শাড়ির আঁচলে গিঁঠ বেঁধে নিয়েছে। তবে এ যা ভিড়, গিঁঠ বাঁধা আঁচলসুদ্ধ হারিয়ে যাওয়া আশ্চর্যের না। ঠাসাঠাসির চাপে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে যে-কোনো মুহূর্তে। অতএব, হাত চেপে ধরায় লজ্জার কোনো কারণ নেই। কিন্তু গঙ্গার লজ্জাটাও অনিবার্য। কখনও এমন করে পুরুষের হাত ধরে বোধহয় চলতে হয়নি। অথচ এখানে হাতের স্পর্শটা কিছুই না। আমরা এখন বহু অঙ্গে বিশাল এক উত্তাল অঙ্গ। হেসে বললাম, 'শক্ত করে ধরে রাখুন। হারালে দুজনেই হারাবো।'

কথাটা উলটে কলে বাজলো। গঙ্গা বললো 'এখনই তো হারিয়ে গেছি মনে হচ্ছে। আমরা তো আর আলাদা নেই। সকলের মধ্যে মিশে গেছি।'

কথাটা মিথ্যা না। হারিয়ে যাওয়া বলতে যা বোঝায়, আমরা তেমনি করেই সকলের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছি। এ হারানোটা নিরিবিলিতে না, আড়ালে আবডালে না। অনেক ভিড়ের মধ্যে থেকেও, দুজনের আলাদা করে হারিয়ে যাওয়া বনমালী মুখুজ্জে মশাই, আর তাঁর বলির পশুসহ দলবলও এই ভিড়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছেন। দেখতে পাচ্ছি না। দু বছর আগের একটা ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। প্রয়াগের কুম্ভমেলায় ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নানার্থীদের ভিড় এর থেকেও যেন ঠাসাঠাসি ছিল। ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই, ভয়ের শিহরন লাগলো। মানুষের পায়ের তলায় মানুষ পিষ্ট হয়ে মরেছিল। মৃতের কোনো যথার্থ হিসাব হয়নি। চিতা নিভতে কয়েকদিন সময় লেগেছিল। এবার আমার হাত শক্ত হল। গঙ্গার হাত সবলে চেপে ধরলাম। গঙ্গা আমার দিকে মুখ তুলে তাকালো। ওর চোখে জিজ্ঞাসা। ধুলা আর ঘামে আরক্ত মুখ। বললাম, 'আরো শক্ত করে ধরে রাখুন। থামবেন না, আর সোজা হয়ে থাকবেন। পড়ে গেলেই সর্বনাশ, মানুষের পায়ের তলায় পিষে যেতে হবে।'

'এত ভয়, এত কষ্ট, তবু এমন জায়গায় আসতেই হবে?' গঙ্গার ধুলা মুখে হাসি।

আমি জবাব দেবার আগেই, গঙ্গার ঘাড়ে ঠেকানো এক হাসকুটি কালো যুবতী বউ হেসে বাজলো, 'হঁ গ, আসতেই হবে। বুড়োরাজের থানে আসতে গেলে ভয় কষ্ট মানতে নাই। সোয়ামির হাত শক্ত করে ধরে চল।'

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, 'না না, আমরা—।'

'থাক্, এখন আর শোধরাতে হবে না।' গঙ্গা মুখ থাবাড়ি দিয়ে আমাকে থামালো, 'সেটা হবে আর এক ফ্যাসাদ। কৈফিয়তের ঠ্যালায় অস্থির হতে হবে।'

মেয়ে মদ্দ সকলের গায়ে গায়ে পায়ে পায়ে জড়াজড়ি। গঙ্গার চোখে ভ্রূকুটি ইশারা। বুঝতে অসুবিধা হল না। এই ভিড়ে, আমাদের সম্পর্কটা ব্যাখ্যা করতে গেলে, নতুন জিজ্ঞাসা অনিবার্য। তখন সত্যি মিথ্যের ফাঁদে পড়ে, বেআক্কেল হতে হবে। কী

রা যায় আসে, কে আমাদের কী ভাবলো। নিজেদের তো জানাজানি আছে। অতএব য়ে যা খুশি ভাবো। সাবধানে চল!

এখন গঙ্গার এক হাত আমার কোমরে। শরীরের ছুৎমার্গিতার কোনো প্রশ্ন নেই। প্রাণের দায়ে স্পর্শানুভূতি মস্তিষ্কে কোনো ঝংকার তোলে না। কিন্তু যতো এগোচ্ছি, ভিড় যেন ভয়ংকর হয়ে উঠছে।

কিন্তু এ ভয়টা যে কিছুই না, সেটা যতো এগিয়ে গেলাম, ততো বুঝতে পারলাম। চিৎকারে কান পাতা দায়। বলি শুরু হয়ে গিয়েছে। বড় একটা পাকা দোতলা বাড়ির সামনে এসে আর কোথাও যেতে পারি না। একটা বিরাট দল লাঠিসোটা নিয়ে মার মার করে এগিয়ে এলো। সঙ্গে মেয়েরাও। যাদের অঙ্গের বসন উদাস। উদ্ধত শরীরে বীরাঙ্গনার স্বরে হাঁকাড়। লাঠিতে লাঠি ঠকাঠক।

গঙ্গার গায়ে মুখে ছিটকে রক্ত লাগলো। আমার ঘাড়ের ওপর একটা মুণ্ডহীন পশুর কালো নধর ধড়। দুজনে দুজনকে আঁকড়ে ধরলাম। পুলিশ এলো ছুটে। লাঠি উঁচোবার উপায় নেই। যার বলি, তাকে দাও। একটা আধটা না। ধড় নিয়ে টানাটানি। আমি গঙ্গাকে নিয়ে একপাশে সরে যাবার চেষ্টা করলাম। আমার ঘাড় থেকে তখন ধড় টেনে নিয়েছে। গায়ের পাঞ্জাবিটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু দাঁড়াবো কোথায়?

'এই যে আপনারা। আর আমি আপনাদের খুঁজে মরছি।' হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে উদয় হলেন বনমালী মুখুজ্জে। বললেন, 'আপনি মায়ের হাত ধরুন' বলে, আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন, 'বাবার থানে চলুন আগে, তারপরে এক জায়গায় বসাব।'

মনে হলো, আমরাই বলির পশু। ঘামে ধুলায় কাদা মাখামাখি শরীরের পাহাড় ঠেলে চলেছি। সামনে বিরাট নাটশালা। সেখানেও ভিড়। তারই মধ্যে চারপাশে নানা পশরা সাজানো দোকান। সেদিকটায় কিঞ্চিৎ ফাঁকা। বেশ কিছু মিষ্টির দোকান। আসলে খাবারের দোকান না বলে, পুজো দেবার মণ্ডা মিঠাই আর ফুলের দোকান বলাই উচিত। বুড়োরাজ তা হলে রক্ত মাংস ছাড়া মিষ্টিও খান! রক্তারক্তি দেখে বিশ্বাস হয় না। ঐ সব ভক্তরাই বোধহয় আসলে নিরামিশাষী। ব্যাটারি সেটের মাইকে গান আর সার্কাসের খদ্দেরকে ডাকাডাকি, 'বাঘের খেলা। রইল বেঙ্গিল টেগারের মুখে মানুষের মুণ্ডু, বিস্ পয়সা!...

'দেখুন।' গঙ্গা আমার জামা টেনে ধরলো।

ওর লক্ষে তাকিয়ে দেখি, বিরাট এক তেঁতুলতলায় শূয়োর বাঁধা। ত্রাহি চীৎকার জুড়েছে। কালো জোয়ান পুরুষের হাতে খড়্গ উঠলো। বরাহ মুণ্ডু ছিটকে গেল। মনে হলো, হত্যালীলার এক বীভৎস খেলা চলছে। কিন্তু বরাহ বলির কথা শুনিনি। চোখেও কখনও দেখিনি। অবিশ্যি অন্যভাবে বরাহ হত্যা দেখেছি। বলির থেকে

সে-দৃশ্য নৃশংস। কিন্তু মনে অবাক জিজ্ঞাসা, খড়্গ কি বরাহ্ কণ্ঠও ছিন্ন করতে পারে? না কি অস্ত্রটি অন্য কিছু? যাই হোক, দেখছি, বুড়ো শিব তাও নেন। বলি এক জায়গায় হচ্ছে না। বিশাল এক গাছতলায় খড়ের ঘর। সেখানে নরনারীর প্রচণ্ড ভিড়। দাওয়ার নিচেই যূপকাষ্ঠ। এক ফাঁকে চোখ পড়লো মাত্র। সেখানে মানুষের দেওয়াল। বলির পশু মানুষের মাথা ডিঙিয়ে সেখানে পড়ছে। ছিটকে উঠছে রক্ত। তারপরেই আবার মারামারি কাড়াকাড়ি। যুপকাষ্ঠের ছড়াছড়ি গোটা প্রাঙ্গণ জুড়ে। রক্তের ধারা চারদিকে।

বনমালীবাবু বললেন, 'মন্দিরে এখন ঢোকা যাবে না। বাবার মাথায় ফুল পড়েছে, দুধ ঢালা হচ্ছে। এইটুকুনই যা ভরসা। চলুন মন্দিরের পেছনে যাই।'

যাবো কেমন করে? কেমন করে আবার? যেমন করে সবাই যায়। জবাবটা নিজেকেই নিজে দিই। গঙ্গাকে চিনতে পারছি না। মুখে গায়ে রক্ত। এলোকেশী। চোখে এখন আর সেই খুশির ছটা নেই। একটা আতঙ্কের ছায়া। আমার কোমর জড়িয়ে ধরে আছে। এই ধরাধরি ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে দ্বিধা সংকোচের বাধা অনেক আগেই দূর হয়ে গিয়েছে। রক্তে মাটি পিছল। খড়ের চালা মাটির দেওয়াল, মন্দিরের চারপাশে দড়িতে ঝুলছে অজস্র ঢ্যালা। আরও ঢ্যালা বাঁধছে রমণীর দল। পুরুষ কম। কেবল ঢ্যালা না। ছোট লোহার ত্রিশূলও বেঁধে ঝুলিয়ে দিচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এসব বাঁধাবাঁধির ব্যাপারটা কী?'

জবাব দিতে যাচ্ছিল গঙ্গা। আর আগেই বেজে উঠলেন বনমালীবাবু, 'মানতের ঢ্যালা বাঁধছে। বাঁজা মেয়ের ছাঁ হবে, শূল পিত্ত বাত ব্যাধি দূর হবে। এমন কি মশাই বোবা কথা কইবে, কানা দেখতে পাবে। সেই মানত।'

আকাঙ্ক্ষিতের আশা। অসহায়ের বিশ্বাস। সেই সঙ্গে ডাক, 'জয় বাবা বুড়োরাজের জয়।'

মন্দিরের পিছনে গিয়ে দেখি, বেজায় ভিড়। একটা নালিমুখ দিয়ে দুধ গড়িয়ে আসছে। সেই দুধ সবাই অঞ্জলি ভরে নিচ্ছে। মুখে দিচ্ছে। শিশিবোতলে, ঘটি গেলাসে ভরছে। শুনলাম, বাবার চরণামৃত সংগ্রহ হচ্ছে। তার মধ্যেই এখানে ওখানে সন্ন্যাসী ভৈরবীর ভর। সেখানে মেয়েপুরুষ ভেঙে পড়ছে। কে আগে তার কথাটি জিজ্ঞেস করবে তার জন্যে ধস্তাধস্তি, 'ও বাবা, আমার সোয়ামির খবর বল।' 'ও মাগো, মা, জামাইয়ের পুষ্টি হবে কি? মেয়ে আমার বাঁজা থাকবে কতকাল? ঘর ছাড়বে না তো?'

ভর যাদের হয়েছে, তাদের জ্ঞান আছে বলে মনে হয় না। মৃগীরুগীর মতো মুখ ঘষছে মাটিতে। মুখের লালা গড়াচ্ছে। মুখে ধুলা কাদা মাখামাখি। অঙ্গের বস্ত্র শাড়ির সাব্যস্ত নেই।

তারপরই ঘুরে এসে আর এক দৃশ্য। বলির পশু নিয়ে টানাটানি কেবল না। ছাল ছাড়িয়ে টানাটানি।

গঙ্গা যেন শিউরে উঠে আমার বুকে মুখ গুঁজে দিল। প্রায় আর্ত, কান্না উদ্‌গত স্বরে বললো, 'এখান থেকে চলুন। আমি আর এসব দেখতে পারছি না।'

ভিড়ের মধ্য থেকে কে বলে উঠলো, 'ঘরে লিয়ে চলে যান, বউ আপনার ভিরমি যাচ্ছে।'

কারা যেন হেসে উঠলো। মত্ত হাসি, এবং সেই সঙ্গে একটি মন্তব্য, 'অমন ফুলটুসি বউ নিয়ে বুড়োরাজের গাজনে আসা কেন বাপু?'

গঙ্গার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। ও আমার বুক থেকে মুখ তুললো না। এই ভিড়ে, এত লোকের সামনে, আমার কি একটুও সংকোচ হচ্ছে না? হচ্ছে। কিন্তু গঙ্গার অবস্থাও বুঝতে পারছি। এখানে আমি না থেকে ক্ষ্যাপাবাবা থাকলে, ও তাঁর বুকেও এমনি করেই মুখ গুঁজে দিত। ও অজ্ঞাতকুলশীলা বটে। কিন্তু ক্ষ্যাপাবাবার আশ্রমে ও অন্যভাবে মানুষ হয়েছে। সামাজিক বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে, ওর হৃদয় যতো অনায়াস, মন সংস্কারহীন, মানুষের রক্ত নিয়ে উল্লাসে ততোটাই বীভৎস।

আমি উৎকণ্ঠিত ব্যস্ততায় বনমালীবাবুকে খুঁজে বের করলাম। তিনি আমাদের নিয়ে ভিড় ঠেলে আবার সেই দোতলা বাড়ির সামনে। বাঁ দিক দিয়ে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেলেন। ভাবলাম, এবার শান্তি। কিন্তু সেখানেও রোয়াকে উঠোনে ঘরে ঘরে ভিড়। অধিকাংশই মহিলা, নানা বয়সের। পুরুষও আছে। বলির পশুর মুণ্ডুর পাহাড় জমেছে এক পাশে। ধড়ও কম নেই। ছাল ছাড়ানো চলছে। গঙ্গাকে নিয়ে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। সেই ঘরে রয়েছে বড় একটা তক্তপোষ। গঙ্গা তক্তপোষে উঠে এক কোণে নিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসলো। এ ঘরেও অবিশ্যি গায়ে রক্তমাখা কয়েকজন নরনারী মেঝেয় বসে আছে। সকলেই দম নিতে এসেছে। আবার যাবে।

একটা আয়নায় নিজেকে দেখতে পেলাম। চিনতে পারলাম না। মুখে ধুলা আর রক্ত। মাথার চুলে রক্ত শুকিয়ে লেগে আছে। জামাটা দেখলে খুনী বলে মনে হয়। ধুতিটাও বাঁচেনি। গঙ্গা মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো। বললো, 'একটু জল খাব।'

বনমালীবাবু কাছেই ছিলেন। বললেন, 'দেখছি।'

একটু পরে এক টকটকে ফরসা মহিলা এলেন জলের ঘটি নিয়ে, 'এই নাও মা, জল নাও।'

ঘটির গায়ে রক্ত লেগে আছে। গঙ্গা ঘটি নিয়ে চুমুক দিতে গিয়ে থমকে গেল। বললাম, 'রক্ত শুকিয়ে গেছে। জলে লেগে নেই। আপনি খান, আমিও একটু খাব।'

'তবে আপনি আগে খান।' গঙ্গা ঘটি বাড়িয়ে দিল।

আপত্তি টিকবে না জানি। ঘটি তুলে আলগা করে গলায় ঢাললাম। জলের মধ্যে মাটি। উপায় নেই। গঙ্গাও সেইভাবেই গলায় জল ঢাললো। তারপরে থু থু করে

মাটি ফেললো মুখ থেকে। বললো, 'আমরা তো গরুর গাড়িতে যেতে পারি। সেখানে জল আছে। চিড়ে মুড়ি মিষ্টিও আছে।'

সত্যি, বেলা চলে গেল কোথা দিয়ে। খিদে পাবার কথা। গঙ্গার ধুলামাখা মুখ ইতিমধ্যেই যেন শুকিয়ে শীর্ণ। যতোটা ভিড়ে আর রক্তাক্ত দৃশ্য দেখে, ততোটা খিদেয় না। বললাম, 'হ্যাঁ, তাই চলুন।'

বেরিয়ে যাবার মুখে বনমালীবাবু এগিয়ে এলেন, 'এবার কিছু খাওয়া দরকার।'

বললাম, 'আমরা গাড়িতে যাচ্ছি, সেখানেই খাবো।'

'যেতে পারবেন?'

'পারবো।'

'আমার এখনো কাজ কিছু বাকি আছে। এখানে আর নতুন করে কিছু দেখার নেই। তবে মন্দিরের মধ্যে আপনার ঢোকা হল না।'

বললাম, 'অন্য সময় এসে দেখবো। এ যাত্রায় বাইরে থেকেই বিদায় নিতে হচ্ছে।'

বনমালীবাবু আমাদের সঙ্গে বাড়ির বাইরে এসে বললেন, 'তেমন বুঝলে বা ইচ্ছে করলে, মাকে নিয়ে আপনি বেলেরহাট রওনা হয়ে যাবেন।'

জামালপুর গ্রামের বাইরে এসে যখন দাঁড়ালাম, তখন আমার জামার কাঁধ ছেঁড়া। গঙ্গার শাড়িতে গাছকোমর বাঁধা। তবু শান্তি। কারণ, ভিড় থাকলেও সেই ভয়াবহ অবস্থা নেই। তবে বলির পশু নিয়ে টানাটানি চলছে সারা পথ জুড়ে। আবার উল্লাসের উত্তাল মিছিলও আছে। মেয়ে মদ্দ উদ্দাম। দ্রব্যগুণের মাতন। বোধহয় ওটা ছাড়া হয় না।

গাড়ির গরু ছাড়া। গাড়িটা শোয়ানো। চালককে দেখতে পেলাম না। ছইয়ের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখি, ভেজা কাপড়ে জড়ানো একটা বলির পশু। কাপড়টা রক্তে ভিজে উঠেছে। গঙ্গা চোখ কপালে তুলে বললো, 'এখানেও সেই জিনিস?'

কোথা থেকে চালক এসে বললো, 'কী করব বলেন, একজন এসে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল।'

আমি বললাম, 'গরুর জোয়াল চাপাও। আমরা রওনা দেবো।'

'বাবু আসবেন না?' চালক বিচলিত হলো।

'আসবেন। উনি ওঁর গাড়িতে যাবেন। আমরা তার আগেই চলে যাবো।' আমাকে একটু চোখা করে নির্দেশ দিতে হলো। না দিয়ে উপায় ছিল না। পাছে বাবুর দোহাই পেড়ে, না যাবার মতলব করে।

গরু জুততে সামান্য সময়। কিন্তু কার বলির পশু আমরা নিয়ে চলেছি? তার আগে নিজেই খাবার বের করলাম। গঙ্গা আগে জালায় ঘটি ডুবিয়ে প্রাণভরে তৃষ্ণা মেটালো। মিষ্টির হাঁড়িটা বের করে আমার সামনে দিল, 'খান।'

'আগে আপনি খান।'

'শুনুন, আর আমাকে আপনি বলবেন না।' গঙ্গা আমার কাঁধে হেলান দিয়ে বসেছিল। এখন ও নিজেকে ফিরে পেয়েছে। চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আমাকে একটা কথার জবাব দেবেন?'

'কী?'

'এত কষ্ট করে এসব ঘুরে দেখেন কেন?' গঙ্গার ভাসা চোখে গভীর ঔৎসুক্য।

হেসে বললাম, 'এসব বলে তো বিশেষ কিছু নয়। সব কিছুই দেখতে ইচ্ছে করে। রূপ তো অনেক। এটা সব নয়।'

গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। গঙ্গা জিজ্ঞেস করলো, 'কষ্ট হয় না?'

'হয় আবার ভুলে যাই?' হেসে বললাম, 'এখন আর কষ্ট হচ্ছে না। ভাবছি, আমার দেশের কতো জায়গায় কতো কী ঘটে। কতো মানুষের কতো বিশ্বাস সংস্কার, পিছনে রয়েছে একটা ইতিহাসের ধারা। আর এই যে গ্রাম—এ যে আমাদেরই দেশ, এই যে আমরা, সেটা তো এভাবেই জানতে পারি।'

গঙ্গার অবাক চোখে একটা অন্যমনস্কতা নেমে এলো। বেলা গড়িয়ে বিকাল। বাতাসে সাদা চন্দনের মতো ধুলা উড়ছে। সাবেক কালের বিচ্ছিন্ন গঙ্গা এখন শুকু শুকু। ক্ষীণ জলের ধারায় রক্তাভা। পাখি ডাকছে, কুহু কুহু।...

জিজ্ঞেস করলাম, 'গঙ্গা, কষ্ট হচ্ছে?'

কাদা রক্ত মাখা মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটলো। ভাসা চোখে কালো দ্যুতি, 'না। মনে হচ্ছে, এমন কষ্ট অনেক সইতে পারি, যদি আপনার মত করে দেখতে পারি। সত্যি কি অজয়ের ওপারে চলে যাবেন কাল?'

বললাম, 'আগামীকাল নিমাইয়ের সন্ন্যাসস্থানে যাবো। যেখানে তিনি তাঁর চাচর কেশ মুণ্ডন করেছিলেন। তারপর অজয়ের ওপারে যাবো।'

গঙ্গার দৃষ্টিতে যেন স্বপ্নের ঘোর, 'আমি যাবো?'

আমি হেসে বাইরের দিকে তাকালাম। জানি, গঙ্গা কোথায় ঠেকে আছে। বললাম, 'তোমার জায়গা তো এখনও ঠিক হয়নি। আমার সঙ্গে তোমার রাস্তা মিলবে না। তুমি জানোই।'

'কাল তবে ছাড়াছাড়ি?' গঙ্গাও বাইরের দিকে তাকালো।

আমি কোনো জবাব দিলাম না। বুঝতে পারছি, গঙ্গা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ দেখে কিছু কি পড়তে পারছে? ওকে বোঝাতে পারবো না, আমি রূপনগরের পথ ধরেছি। ও এক জায়গায় বাঁধা পড়ে আছে। সেটা ওর মন। ওর মুক্তিটা অন্যখানে। আমার পথে না। রূপনগরের দর্পণে নিজেকে খুঁজে ফিরছি। চিনতে পারি না। সে কথাটা আজ পর্যন্ত কারোকে বোঝাতে পারিনি। মনোহরা হয় তো এক রকমে বুঝেছে। তার একটা সংকেত দিয়েছিল, আত্মানুসন্ধান। কী কঠিন কথা, কতো অনায়াসে উচ্চারিত হয়।

গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ধরা ছাড়া বলে কি কিছু আছে? তুমি কাল একলা যেতে পারবে তো?'

'আপনি পৌঁছে দিয়ে আসবেন।' গঙ্গার চোখে কৌতুকের ছটা। যোগিনী রঙ্গিণী হয়ে ওঠে।

আমি উদ্বেগে তাকাই। গঙ্গা মুখ তুলে হাসলো, 'জানি, আপনার পথে আমার যাওয়া হবে না। ভয় নেই, ফিরতে পারবো। কিন্তু কী একটা কষ্ট হয় জানেন?'

তাকিয়ে দেখি, যোগিনীর চোখের কোণে টলটল বিন্দু কাঁপে। সহসা কোনো কথা বলতে পারি না। গঙ্গার স্বর যেন রুদ্ধ, 'কেন পারিনে?'

হঠাৎ আমার ভিতরে কোথায় সেই গান বেজে উঠলো, 'তারে দেখতে পারিনে কেন প্রাণ খুলে গো।'…আসলে এই জিজ্ঞাসা নিয়েই তো নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। ভাবি, আমিই কি পেরেছি? কে বা কী পেরেছে? এই মনে ভাবি। গাড়িটা চলছে মাতালের মতো। আমরা টলছি। পূর্ণিমায় চাঁদ উঠেছে কখন, খেয়াল করিনি। গরুর গাড়ির ছইয়ের ফাঁক দিয়ে সন্ধ্যার প্রথম ম্লান জ্যোৎস্নার একটি রেখা এসে পড়েছে। রেখাটি গঙ্গার বুক ডিঙিয়ে চিবুক ছুঁয়েছে। ওর মুখ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু চোখ দুটো কোন্ দিকে বুঝতে পারছি না। অথচ ওর গালে একটা রেখা যেন চিক চিক করছে।

গাড়োয়ান হাঁকছে, 'হঁ হঁ, পথ দেখে চল্ বাবা। ডাইনে বাঁয়ে করে মেজাজ খারাপ করিসনে। পিটিয়ে মারব তা'লে।'

গঙ্গা চোখের জলেই হেসে উঠলো, 'শুনলেন?'

'শুনলাম।'

পথ বেঠিকের মারটা সকলের কপালে এমনি করেই নেমে আসে। অতএব, গঙ্গা যাবে আশ্রমে। আমি যাব আমার পথে।…